রহস্যভেদী মেঘনাদের দুঃসাহসী অ্যাডভেঞ্চার

ড্রাগন পাহাড়ের রহস্য

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

রে অ্যাণ্ড অ্যাসোসিয়েটস্ (পাবলিশিং)
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ :
২৬শে জানুয়ারি ১৯৬৩

প্রকাশক :
পীযূষ রায়
রে অ্যাণ্ড অ্যাসোসিয়েটস্ (পাবলিশিং)-এর পক্ষে
২, গুরু প্রসাদ চৌধুরী লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রক :
দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২ গুরু 'প্রসাদ চৌধুরী লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ :
ইন্দ্রনীল ঘোষ

পবিবেশক :
অন্নপূর্ণা প্রকাশনী
৩৬ কলেজ রো
কলকাতা-৭০০০০৯

পরম কল্যানীয় অনুজ

শ্রীমান তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

করকমলে

—দাদা

লেখকের নিবেদন

উপন্যাসটি 'ঝলমল' কিশোর পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশকালে আমি পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে অভিনন্দন লাভ করে উৎসাহিত বোধ করেছি। এই সুযোগে তাঁদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরম সুহৃদ শ্রী পীযূষ রায়ের আগ্রহাতিশয্যেই এ বই এত সত্বর প্রকাশ করা সম্ভব হোল। তাঁর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

২৬শে জানুয়ারি, ১৯৬৩ স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

১০সি, জগন্নাথ সরকার লেন,

খিদিরপুর, কলকাতা-৭০০০২৩

এই লেখকের অন্যান্য বই

পুরুষ বর্জিত নাটক (একাঙ্ক সংকলন)

দ্বিতীয় বিশ্বের অভিযাত্রী

মেঘনাদের আগামী অ্যাডভেঞ্চার :

চিঙ্কার চিংড়ী বিভীষিকা

এক

[এক অবিশ্বাস্য চিঠি]

ঘরে ঢুকতেই সর্বপ্রথমে চোখে পড়ল বই-এর মলাটটা। মলাটে অদ্ভুত জীবন্ত একটা প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের ছবি। থমকে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলাম—ফিজিক্যাল ফিজিওলজি। লেখক—লিড অ্যাণ্ড জুডান।

মেঘনাদ আমার উপস্থিতি টের পায় নি। সোফায় আধশোয়া-ভাবে বসে একমনে বইটা পড়ে চলেছে।

অগত্যা গলাঝাড়া দিতে হল। মনোযোগী পাঠকের ধ্যানভঙ্গের অপেক্ষায় অনির্দিষ্ট কাল তো আর অপেক্ষা করা যায় না।

মেঘনাদ আমার দিকে তাকিয়েই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল—আরে অর্ণব, এতক্ষণ তোর অপেক্ষাতেই ছিলাম। আমি কিন্তু একেবারে রেডি!

ঘরের দিকে এতক্ষণ নজর দিই নি। এবার দেখলাম—সুটকেশ, সাইড ব্যাগ সব গুছোন, এমন কি সেগুলো ঘরের কোণে নিখুঁত ভাবে সাজানো পর্যন্ত রয়েছে।

—তুই যাচ্ছিস তো আমার সঙ্গে?

মেঘনাদের কথা শুনে এবার সত্যিই হাসি পেল। ও কি আমার সম্মতির অপেক্ষায় কখনও বসে থেকেছে? আর সেই মুহূর্তে আমার ভাবনার প্রতিধ্বনিটাই শুনতে পেলাম ওর মুখে—আমি কিন্তু তোকে না জানিয়েই দিল্লি কালকা মেলের দুখানা বার্থ রিজার্ভ করে রেখেছি। আজ রাত আটটা পঁয়ত্রিশে ট্রেন হাওড়া ছাড়বে।

আসলে সমস্ত ব্যাপারটাই আকস্মিক। আজই দুপুরে মেঘনাদ আমার অফিসে হঠাৎ ফোন করেছিল—কথা একটাই, পরের দিন থেকে কমসে-কম পনের দিনের ছুটি নিয়ে যেন ওর সঙ্গে আজই দেখা করি।

আমি স্বভাবতই জানতে চেয়েছিলাম, কারণটা কি? ও শুধু বলেছে ব্যাপারটা খুবই ইন্টারেস্টিং। এর বেশি আর ভাঙতে চায় নি।

আমিও অবশ্য খুব বেশি জেদাজেদি করি নি। মেঘনাদের স্বভাবটা ভালমতো জানি বলেই। মেঘনাদ আমার সব থেকে নিকট বন্ধু। স্কুল, কলেজে একসঙ্গে পড়েছি, যদিও কর্মক্ষেত্রে দুজনের পথ সম্পূর্ণ আলাদা। আমি সরকারী অফিসের মসীজীবী আর মেঘনাদ চাকরি করে এক পাক্ষিক সংবাদ-পত্রিকার অফিসে। সাংবাদিক এবং সেই সঙ্গে মিলিটারীর একজন এক্সসার্ভিস ম্যান। জার্নালিজম পাশ করে কি খেয়াল হতে মিলিটারীতে ঢুকেছিল। তারপর সেখানকার কার্যকাল শেষ হয়ে যাবার পর গত বছর থেকে পাক্ষিক 'তাজা খবর'-এ রিপোর্টারের চাকরিটা নিয়েছে। কিন্তু দুঃসাহসের নেশাটা ছাড়তে পারেনি। পত্রিকার মালিক হরিসাধনবাবুও খুব চালাক লোক। এসব ব্যাপারে মেঘনাদকে বরং উৎসাহিতই করেন—অবশ্যই তাঁর পত্রিকার বৃহত্তর স্বার্থে। আর আমি মেঘনাদকে শুধু বন্ধু হিসেবেই ভালবাসি না, ওকে আমি শ্রদ্ধা করি, ভরসা করি। শ্রদ্ধা করি ওর সাহস আর বুদ্ধিকে। কোন কিছুতেই ওকে কখনও নার্ভাস হতে দেখি নি, ভয় পেতেও না। বরং যে কোন বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়াটাই বোধহয় ওর নেশা।

তাই মেঘনাদ যখন ফোনে সংক্ষেপে ওর বক্তব্য সারলো তখনই বুঝলাম নতুন কোন অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেয়েছে ও। সুতরাং আমায় সঙ্গে না নিয়ে ছাড়বে না।

মেঘনাদের সামনে বসেই কথাগুলো ভাবছিলাম।

হঠাৎ মেঘনাদ বলল—ক্যাপ্টেন সিংকে তোর মনে আছে?

—ক্যাপ্টেন সিং। মনের মধ্যে আমি হাতড়াতে থাকি।

—হ্যাঁ রে, মিলিটারীতে থাকতে আমার খুব বন্ধু ছিল। তোর সঙ্গেও তো আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। লম্বা চওড়া বিশাল চেহারা। আমায় খুব পছন্দ করতো।

এবার মনে পড়েছে। বললাম—হঠাৎ ক্যাপ্টেন সিং-এর প্রসঙ্গ তুললি যে?

—ক্যাপ্টেন সিং এখন আছেন ভারতের উত্তর সীমান্তে হিমালয়-পাদদেশে শিনকি গিরিসংকট অঞ্চলে। এখানে টহলদারী এক ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন তিনি। কয়েকদিন আগে সিং আমায় একটা চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিটা আমার কাছে অদ্ভুত মনে হয়েছে। চিঠিটা তুই পড়ে দেখতে পারিস।

টেবিলের ড্রয়ার খুলে কয়েক পৃষ্ঠার একটা দীর্ঘ চিঠি মেঘনাদ আমার দিকে এগিয়ে দিল।

ক্যাপ্টেন সিং মেঘনাদকে যা লিখেছেন এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম। সত্যিই, চিঠির বক্তব্য ভারি অদ্ভুত এবং সেই সঙ্গে অবিশ্বাস্য।

হিমালয় পাদদেশে গভীর অরণ্য অঞ্চল শিনকি গিরিসংকট এলাকায় এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে চলেছে। সেখানে নাকি এক ভয়ঙ্কর ড্রাগনের আবির্ভাব হয়েছে, সেই অঞ্চলের এক আদিবাসী সম্প্রদায় এই ড্রাগনকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করে এবং প্রতি বছর বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে একটি করে জীবন্ত মানুষ নিবেদন করে ড্রাগন দেবতার নৈবেদ্য হিসেবে। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে চলেছে গত বেশ কয়েক বছর যাবৎ। কত বছর তা ক্যাপ্টেন সিং বলতে পারেন না, কারণ ওই আদিবাসী সম্প্রদায় এ সম্পর্কে আশ্চর্য গোপনীয়তা রক্ষা করে চলে এবং ওরা আশপাশের সমস্ত ট্রাইব থেকে বিচ্ছিন্ন এক ভিন্ন জীবনযাত্রা নির্বাহ করে চলেছে, তবে সম্প্রতি এমন একটি ঘটনা ঘটেছে যার ফলে ওদের সম্পর্কে সরকারী কর্তাদের টনক নড়ে গেছে। তবে ক্যাপ্টেন সিং যেটুকু অনুসন্ধান

করে জেনেছেন তাতে তিনি স্থির নিশ্চিত যে একটা কিছু অবিশ্বাস্য ব্যাপার দিনের পর দিন ঘটে চলেছে ওখানে। এমন কি ভয়ঙ্কর ড্রাগন আকারের বিশাল এক জানোয়ারকে নিজের চোখে একদিন পাহাড়ী পথে হাঁটতে দেখেছেন তিনি। বীভৎস তার আকৃতি। লম্বায় প্রায় ষাট ফুটের মতো। সামনের পা দুটো ছোট ছোট। পেছনেব দুটি পা এবং ল্যাজের উপর ভর দিয়ে হাঁটে। তার অমানুষিক গর্জনে পাহাড়ের চাঙড় পর্যন্ত নাকি ভেঙে পড়ে—লিখেছেন ক্যাপ্টেন সিং।

ভারত সরকার ব্যাপারটা সম্পর্কে একটা প্রাথমিক গোপন তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সে ভার পড়েছে ক্যাপ্টেন সিং-এর উপরই। এখানকার পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সরকারী তরফে সব থেকে বেশি পরিচিত তিনিই।

ক্যাপ্টেন সিং এ তদন্তের ব্যাপারে মেঘনাদের কাছে প্রত্যক্ষ সাহায্য চান। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আরো তথ্য তিনি মেঘনাদকে সাক্ষাতে জানাবেন।

চিঠিটা পড়তে পড়তে সব কিছুই আমার কাছে অস্বচ্ছ মনে হচ্ছিল। রূপকথার ড্রাগন কি কখনও বাস্তবে সত্য হতে পারে?

চিঠিটা পড়া শেষ করে মেঘনাদের হাতে ফেরত দিতেই ও বলল—কি বুঝলি?

—কিস্যু না। স্রেফ ধোঁয়া। চীন জাপানের রূপকথার ভূত যে শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন সিং-এর মতো এক জাঁদরেল মিলিটারী অফিসারের ঘাড়ে চাপবে, তা আগে ভাবতেই পারি নি।

—তার মানে তুই বলতে চাস সবটাই গাঁজাখুরি?

—অন্তত কষ্টকল্পনা তো বটেই। ওই সব অঞ্চল সম্পর্কে আজগুবি নানা ধরনের কথা মাঝে মাঝেই শোনা যায়। ইয়েতি বা তুষারমানব নিয়ে কিছুদিন আগে কি কম হৈ চৈ হয়েছিল? আসলে নিঃসঙ্গ নির্জন এলাকায় বিভ্রান্তি খুব বেশি করে তাড়া করে বেড়ায়। যেমন

মরুভূমিতে মরীচিকার কবলে প্রচুর লোক প্রাণ হারিয়েছে। একটু থেমে বললাম—ক্যাপ্টেন সিং হিমালয়ের পাদদেশে বর্তমানে যে অঞ্চলে বাস করছেন সেখানে এমন ধরনের বিভ্রান্তি খুবই সম্ভব মেঘনাদ।

মেঘনাদ কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল—কিন্তু সেখানে যেতে আমাকে হবেই অর্ণব। ক্যাপ্টেন সিংকে আমি আজই সকালে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়েছি।

দুই

[মেঘনাদের ফিজিক্যাল ফিজিওলজি]

অগত্যা আমাকেও সেই দিনই দিল্লি কালকা মেলের যাত্রী হতে হল।

মনে যাই ভাবি, সমস্ত ব্যাপারটা আমার যতই অবাস্তব মনে হোক, মেঘনাদকে আমি কখনও অস্বীকার করতে পারি নি।

আমি জানতাম একবার যখন মনস্থ করেছে, এ সংকল্প থেকে মেঘনাদকে নড়ানো যাবে না।

তাছাড়া লোকসানটাই বা কোথায়? ড্রাগন রহস্যের মীমাংসা হোক বা না হোক এই সুযোগে কটা দিন বেড়িয়ে নেয়া তো যাবে। হিমাচল প্রদেশের ওই সব পাহাড়ী অঞ্চলে ইচ্ছে করলেই সব সময় বেড়িয়ে আসার সুযোগ হয়ে ওঠে না। অথচ সাধ বহুদিনের।

এতদিনে সে সাধ পূরণ হতে চলেছে।

গন্তব্য আমাদের হিমাচল প্রদেশের রাজধানী সিমলা ছাড়িয়ে তিব্বত সীমান্তের কাছাকাছি দুর্গম পাহাড়ী এলাকা শিনকি গিরিসংকটের নিকটবর্তী গিরি উপত্যকা।

তবে আপাততঃ এই ট্রেনে গিয়ে পৌঁছবো প্রথমে কালকায়। সেখান থেকে অন্য ট্রেন ধরে সিমলায়।

মেঘনাদ কিন্তু ট্রেনে ওঠার পর থেকেই ফিজিক্যাল ফিজিওলজির সেই বইটা মুখে নিয়ে বসেছে—যার মলাটে একটা প্রাগৈতিহাসিক জীবের ছবি আঁকা।

সেদিন রাত্রে আর মেঘনাদের সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা হল না।

টিফিনকেরিয়ারে লুচি, কষামাংস আর সন্দেশ ছিল। দুজনে খেয়ে দেয়ে আপার বার্থে লম্বা হলাম। ট্রেনের মিষ্টি দোলায় ঘুম আসতে দেরী হল না। রাত্রে যখন একবার ঘুমটা ভাঙলো, হাতঘড়িতে রাত দুটো বেজে গেছে। ট্রেন বাঙলাদেশ ছাড়িয়ে চলে এসেছে অনেক দূর। মেঘনাদ কিন্তু তখনও বইটা ছাড়ে নি। আশ্চর্য মনোযোগী পাঠক যা হোক।

পরদিন সকালে উঠে মুখ-টুক ধুয়ে বাথরুম সেরে কুপের ভেতর ঢুকে দেখি মেঘনাদ আগের স্টেশন থেকে দু-ভাঁড় চা নিয়ে জমিয়ে বসে এক ভাঁড় চায়ে চুমুক দিচ্ছে। আমায় দেখে বলল—মুখে দিয়ে দেখ, দারুণ চাটা করেছে। স্টেশনগুলোতে সাধারণত চায়ের নামে যা দেয়—আসলে বিশুদ্ধ গোমূত্র ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না।

লক্ষ্য করে দেখলাম তখনও মেঘনাদের পাশে সেই বইটা উপুড় করা রয়েছে।

বললাম, কি ব্যাপার বল তো, কদিন থেকে দেখছি ফিজিক্যাল ফিজিওলজির ওই বইটা একনাগাড়ে মুখে করে রয়েছিস?

—শুধু মুখে নয় বন্ধু, বলতে পারিস গিলছি। আসার আগে এটি আমার এক অধ্যাপক বন্ধুর কাছ থেকে বাগিয়ে এনেছি। যতই পড়ছি ততই অবাক লাগছে।

—তা প্রাগৈতিহাসিক জীবজন্তুরা আজ তো মানুষের কাছে বিস্ময়-ভরা ইতিহাসই। বললাম আমি।

—সে কথাই সব নয় অর্ণব। পৃথিবীর ইতিহাসে ছ'কোটি ষাট লক্ষ বছর অতীত থেকে তেইশ কোটি বছরের ইতিহাস—যাকে বলে 'মেসোজায়িক' যুগ, তখন সারা পৃথিবীতে একচেটিয়া রাজত্ব করেছিল ওরাই—বিরাট বিরাট আকৃতির টাইরানোসরাস, স্টেগোসরাস, টেরোসরের দল।

—এরা তো প্রকৃত পক্ষে সবাই সরীসৃপ শ্রেণীভুক্ত। প্রাগৈতিহাসিক বিদ্যের কিছুটা আমিও সুযোগ পেয়ে উগরে দিই।

কিন্তু মেঘনাদ আমার কথাকে মোটেই আমল না দিয়ে বলল—এদের চেহারাগুলোর কথা ভেবেছিস? আধুনিক কালের টিকটিকি গোসাপ প্রভৃতির হাজার গুণ বড় আর তেমনি হিংস্র। উড়ন্ত টেরোসর সরীসৃপের ডানা দুটি তো দাঁড়াতো লম্বায় প্রায় সাতাশ ফুটেরও বেশি। শিরদাঁড়াটা সরীসৃপের মতো, পা দুটো বাজপাখির মতো। চামড়ার ডানার মাঝে ছোট ছোট দুটি হাতের মতো যার সাহায্যে গাছের ডাল বা কাণ্ড বেয়ে অনায়াসে চলাফেরা করতো ওরা। মাটির সরীসৃপ তখন সবেমাত্র পাখি হবার উপক্রম করছে।

আমি বললাম, তা তুই হঠাৎ এদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লি কেন বল্ তো?

মেঘনাদ বলল, ডাইনোসরদের ইতিহাস নিয়ে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করছিলাম। এরাই তো এই পৃথিবীর আদি বাসিন্দা। দশ-পনের কোটি বছর আগে যখন বিবর্তনের ইতিহাসে মানুষের চিহ্ন মাত্র নেই তখনই ওরা সারা পৃথিবীর বুকে রাজত্ব করেছে। পাহাড়, জলাভূমির একচ্ছত্র অধিপতি ছিল ওরাই।

—'কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান'—ফস্ করে কবিগুরুর বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিটা মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

মেঘনাদ দার্শনিক ভঙ্গিতে বলল, ঠিকই বলেছিস অর্ণব, পৃথিবীতে কিছুই স্থায়ী হয় না। না হলে চিন্তা করতে পারিস এত ভয়ানক আকৃতি এবং প্রকৃতির জীবেরাও পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেল প্রায় ছ'কোটি তিরিশ লক্ষ বছর আগে।

আমি বললাম, কিন্তু আমাদের বর্তমান অভিযানের সঙ্গে ডাইনোসর প্রসঙ্গের কোন যোগ আছে কি? তুই মিছিমিছি সময় নষ্ট করছিস মেঘনাদ।

—কোন কিছুই বৃথা যায় না বন্ধু। ড্রাগনের উদ্ভব সম্পর্কে চিন্তা করতে করতেই বিষয়টা সম্পর্কে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

—তার মানে?

—মানেটা বোঝা কি খুব শক্ত ? তুই তো জানিস, ড্রাগন চীন এবং জাপানী উপকথার এক ভয়ঙ্কর জীব। সরীসৃপজাতীয়। বিরাট হিংস্র তার আকার। চোখ আর মুখের আগুনে এক একটা জনপদ সে ধ্বংস করে দিতে পারে।

—তুই কি বলতে চাস ?

—আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে, ড্রাগনের আকার প্রকার এবং আচরণের সঙ্গে আমি যেন সেই কোটি কোটি বছর আগের সরী-সৃপজাতীয় ডাইনোসরদের একটা অদ্ভুত মিল পাচ্ছি।

আমি কিছুটা বোকার মতোই তাকিয়ে রইলাম মেঘনাদের দিকে। বুঝতে পারলাম যে ও যা বলতে চায় তা ভাবতে গেলে সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে আরও তালগোল পাকিয়ে যাবে।

তিন

[ক্যাপ্টেন সিং উবাচ]

সিমলায় এসে পৌছলাম আরও কদিন পর সন্ধ্যে নাগাদ। ক্যাপ্টেন সিং মেঘনাদের টেলিগ্রাম পেয়ে নিজেই স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন। লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ চেহারা। সেনাবাহিনীর একজন যোগ্য অফিসার।

মেঘনাদকে দেখেই ক্যাপ্টেন সিং বুকে জড়িয়ে ধরলেন। প্রায় তিন বছর বাদে দেখা দুজনের।

স্টেশনের কাছেই আমাদের জন্যে হোটেলের রুম বুক করা ছিল। আমরা হোটেলে উঠলাম। সঙ্গে লটবহর খুব বেশি ছিল না। যতটুকু না নিলে নয়। এ ব্যাপারে মেঘনাদের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল।

সেদিন রাতটা তাড়াতাড়িই খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে পড়লাম। ক্যাপ্টেন সিং বলে গেলেন পরদিন সকালে এসে তিনি কথা বলবেন।

পরদিন সাত সকালেই ক্যাপ্টেন সিং এসে হাজির। আমরা তখন হোটেলের রুম-এ বসে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছি—টোস্ট, ডিমসেদ্ধ, কলা আর চা।

ক্যাপ্টেন সিং এসে পড়াতে আমরা ওঁর জন্যেও ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিলাম। লক্ষ্য করলাম, ক্যাপ্টেন সিং-এর হাতে একটা বড় ঠোঙায় বেশ কয়েকগুচ্ছ টাটকা আঙুর। সিমলার আঙুর ভারী মিষ্টি। মেঘনাদ তো ভারী খুশি!

চা খেতে খেতে আমাদের কথা হচ্ছিল।

ক্যাপ্টেন সিং আপাততঃ উঠেছেন এখানকার এক মিলিটারী ক্যাম্পে।

চায়ে চুমুক দিয়ে উনি বললেন—মেঘনাদ ভাইয়া, হিমালয় পর্বতমালার নীচে এই পাহাড়ী জঙ্গল এলাকায় এখনও এমন অনেক রহস্য আছে যা ভাবনার বাইরে। এমন অনেক অঞ্চল আছে যেখানে সভ্য মানুষের পায়ের ছাপ পর্যন্ত পড়ে নি। সে সব এলাকার যারা অধিবাসী তারা এখনও রয়ে গেছে সেই প্রাচীন জীবনযাত্রায়—যার অনেক কিছুই দুর্জ্ঞেয়। সভ্য মানুষ যদি কখনও সেখানে প্রবেশ করে, সেই সব আদিবাসীর দল তাকে এড়িয়ে চলতে চায়। নিজেদের জীবনযাত্রা, রীতিনীতি, বিশ্বাসের কথা কিছুই তারা প্রকাশ করে না। শিনকি উপত্যকা এমনই এক দুর্ভেদ্য রহস্যময় অঞ্চল।

মেঘনাদ বলল, জায়গাটা মোটামুটি কোথায় বলতে পারেন ক্যাপ্টেন ?

—জায়গাটা হিমাচল প্রদেশের প্রান্তদেশে। কিছু দূরেই শুরু হয়েছে তিব্বতভূমি। ক্যাপ্টেন সিং বলতে লাগলেন। পাইন, ফার ইত্যাদি পাহাড়ী গাছগাছালির অরণ্যঘেরা একটা দুর্ভেদ্য পাহাড়ী অঞ্চল। যে পাহাড়ী আদিবাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে এই ঘটনার যোগ আছে আগেই চিঠিতে জানিয়েছি তারা ভারী অদ্ভুত জাতের। আশ-পাশের অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীদের সঙ্গেও তাদের কোন যোগাযোগ নেই। তাদের সঙ্গে ভাব জমানোও সহজ কথা নয়। তবু অনেক কষ্টে তাদের সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি, যার অনেক ব্যাখ্যা আমি আজও খুঁজে পাই নি।

—আপনি তো ওই শিনকি উপত্যকা অঞ্চলেই এখন আছেন ? মেঘনাদ প্রশ্ন করে।

—বলতে পারেন কাছাকাছি। ঊর্ধ্বতন সরকারী কর্তৃপক্ষ যেহেতু বিষয়টা নিয়ে আগ্রহী তাই ও ব্যাপারে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত হয়ে ও জায়গা থেকে কিছু দূরে সীমান্ত এলাকায় ওই কাজের অনুসন্ধানের জন্যেই যে মিলিটারী 'বেস' করা হয়েছে সেখানেই থাকতে হয়।

পাহাড়ী ড্রাগন কি আপনি নিজে ওই অঞ্চলেই দেখেছেন ক্যাপ্টেন

সিং ? প্রশ্নটা অনেকক্ষণ ধরেই মনে ঘোরাফেরা করছিল, এবার দুম করে ছুড়ে দিই।

ড্রাগনের প্রসঙ্গ উঠতেই ক্যাপ্টেন নড়ে চড়ে বসলেন। বললেন, সত্যি বলতে কি ওটা নিজের চোখে না দেখলে হয়তো আমিও বিশ্বাস করতাম না অর্ণববাবু। এমন কি সমস্ত ব্যাপারটাই এখনও আমার কাছে দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয়।

—ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করে বলুন তো? মেঘনাদ সিগারেটের প্যাকেট বার করে আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে নিজেও একটা ধরালো।

সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান মেরে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে কয়েক সেকেণ্ড মনে মনে বক্তব্যটা একটু গুছিয়ে নিয়ে তারপর ক্যাপ্টেন শুরু করলেন তাঁর কাহিনী ঃ

শিনকি গিরি উপত্যকা এলাকায় যে আদিবাসী সম্প্রদায় বাস করে তাদের সম্পর্কে বেশ কিছু গুজব দীর্ঘদিন যাবৎই ওই অঞ্চলে ছড়ানো আছে। বলতে কি ওরা সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন বিচিত্র জীবনধারা অনুসারী। অন্য আদিবাসী ট্রাইবদের ধারণা, ওরা বিচিত্র ভয়াবহ দানবের উপাসক। যাকে ওরা বলে ড্রাগন দেবতা।

কয়েক বছর আগে এক টহলদার বাহিনীর ক্যাপ্টেন হয়ে আমি এখানে এসেছিলাম। তখন থেকেই এই জংলী গুজব সম্পর্কে আমি ইন্টারেস্টেড হই। আসলে ব্যাপারটা কি জানতে হবে, কী এমন গোপনীয়তা আছে ওই বিশেষ ট্রাইবটির জীবনধারায়।

ভাবনা যত সহজ, কাজটা কিন্তু তত সহজ মোটেই নয়। দিনের পর দিন নানাভাবে চেষ্টা করেছি ওদের সঙ্গে ভাব জমাতে। নানা উপহারসামগ্রী রেখে এসেছি ওদের কাছাকাছি। নানা উপকার করার প্রচেষ্টা চালিয়েছি কিন্তু তবু ওরা পারত পক্ষে পাত্তা দেয় নি। অবশেষে অনেক কষ্টে কিছুটা পরিচয় হল ওই গ্রামের এক আদিবাসী তরুণ পিংলার সঙ্গে। শক্ত-সমর্থ-সবল-তাজা দেহ। নানা-

রকম সুখাদ্য আর উপহারে ওর মন ভেজালাম। আগুন-ছোড়া যন্ত্র অর্থাৎ বন্দুক চালাতে শিখিয়ে দিলাম পিংলাকে। ও আমার বশ মানল। ওর মুখ থেকেই জানলাম ওই আদিবাসীদের জীবনের কিছু গূঢ় তথ্য।

আমরা রুদ্ধশ্বাসে শুনছিলাম ক্যাপ্টেন সিং-এর কাহিনী। মাঝপথে একবারও বাধা দেবার চেষ্টা করলাম না।

যা জানলাম তা আমার অনুমানের থেকেও অদ্ভুত। এই বিংশ শতাব্দীতে তা রূপকথা মনে হয়। ক্যাপ্টেন সিং আবার তাঁর কাহিনী শুরু করলেন। প্রতি বছর বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে ওরা ড্রাগন দেবতার ভোগে নিবেদন করে একজন করে শক্তসমর্থ যুবাপুরুষ। গ্রামের প্রান্তে একটা বেদীতে হাত পা বেঁধে সেই তরুণটিকে মন্ত্রপূত করে ফেলে রাখা হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ে ড্রাগন দেব আর বাহন নিজে এসে তার সেই পূজার ভোগ অর্থাৎ যুবাপুরুষটিকে মুখে করে নিয়ে যায়।

—এও কি সম্ভব। মেঘনাদ হাতের সিগারেটটা পর্যন্ত টানতে বিস্মৃত হয়েছে।

—হাঁ মেঘনাদ ভাইয়া। আরও আশ্চর্য হল সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে একজন আদিবাসী ওঝা বা পুরোহিত এবং সে কিন্তু পুরুষ নয়—একজন নারী।

নারী ওঝা। মেঘনাদ বেশ অবাক হয়েই বলে—বুনো আদি-বাসীদের মধ্যে এমন কোন রীতির কথা আমার জানা নেই। এইসব আদিবাসী সম্প্রদায় সাধারণত মেয়েদের সম্পত্তি হিসাবেই গণ্য করে এবং তাদের কোন বিশেষ সম্মান দেয় না—একমাত্র সম্পূর্ণভাবে মাতৃতান্ত্রিক কিছু গোষ্ঠী ছাড়া। এরা কি তেমন কোন গোষ্ঠীর···

—না মেঘনাদ ভাইয়া। ক্যাপ্টেন সিং মেঘনাদের কথা শেষ করার আগেই বললেন—এই বিশেষ ক্ষেত্রটি ছাড়া আর সব ব্যাপারেই ওরা পুরুষ-শাসিত। আমি যতদূর সম্ভব খোঁজ নিয়েছি।

—আশ্চর্য ! কথাটা মেঘনাদ খুব অস্ফুটভাবে উচ্চারণ করলেও আমার কান এড়ায় না।

ক্যাপ্টেন সিং আবার শুরু করলেন, ওদের বিশ্বাস ড্রাগন দেবতা বাস করেন শিনকি উপত্যকা থেকে কিছু দূরে এক পার্বত্য এলাকায়। জায়গাটার ওরা নাম দিয়েছে 'ড্রাগন পাহাড়'। সেখানে নাকি কেউ গেলে আর ফিরে আসে না। ড্রাগন দেবতার অভিশাপে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তাই সে পাহাড়ের ধারে কাছেও কেউ যায় না তারা।

—এ বিশ্বাস কতদিন ওদের মধ্যে আছে কিছু জানতে পেরেছেন ? মেঘনাদ প্রশ্ন করল। —ও প্রথমে বলতে রাজী হয় নি। শেষ পর্যন্ত জানিয়েছে ড্রাগন দেবতার পুজো ওদের মধ্যে বহুকাল যাবৎ চলে এলেও ড্রাগন দেবতাকে জ্যান্ত মানুষ ভোগ দেবার রীতিটি খুব বেশিদিনের নয়। সম্ভবতঃ এখনকার সর্দারের বাবার আমল থেকেই নাকি শুরু হয়েছে।

—আর ওই নারী ওঝা ? ও কতদিন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে ?

—এ সম্পর্কে পিংলার কাছ থেকে একটা কথাও বার করতে পারি নি। তবে মনে হয়েছে গ্রামটিতে তার অসীম প্রতাপ। সবাই সম্বোধন করে, 'দেবীরানী'।

—'দেবীরানী।' মেঘনাদ কথাটা শুনে কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে ক্যাপ্টেন সিং-এর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, ওঝা 'দেবীরানী'কে আপনি নিজের চোখে কখনও দেখেছেন ক্যাপ্টেন সিং ?

—সম্ভব হয় নি। আর পিংলাও যা বর্ণনা দিয়েছে তা স্পষ্ট নয়। তবে তার চেহারার গঠনের সঙ্গে নাকি আদিবাসী সম্প্রদায়ের কারুরই বিশেষ মিল নেই আর বয়স কত কেউ তা জানে না। কেউ বলে তিরিশ কেউ বলে পঞ্চাশ বা ষাট আবার কারুর মতে নাকি দু'তিনশোর বেশি। ক্যাপ্টেন সিং বললেন।

এরপর আর কেউ কোন কথা বলল না। তারপর মেঘনাদই

নীরবতা ভাঙল—আর সেই ড্রাগন, সেটাকে আপনি দেখলেন কোথায় ?

ক্যাপ্টেন সিং আর একটা সিগারেট ধরাচ্ছিলেন, মেঘনাদের কথায় থমকে গিয়ে সিগারেটটা না ধরিয়েই বললেন—ড্রাগন পাহাড়ের দিকে আমি নিজেই একদিন গিয়েছিলাম।

চার

[ভয়ঙ্কর ড্রাগন]

—ড্রাগন পাহাড় ! মানে পাহাড়ী আদিবাসীরা যেখানে সেই ড্রাগন দেবতা বাস করে বলে বিশ্বাস করে ? আমি জিজ্ঞেস করলাম ।

—হ্যাঁ অর্ণববাবু । এ ঘটনাটা ঘটেছে মাত্র মাস খানেক আগে । আসলে দীর্ঘদিন এ সম্পর্কে নানা ধরনের সংস্কার আব গুজব শুনতে শুনতে ইচ্ছেটা মনে জেগেছিল বহু আগেই । পিংলাকে ইচ্ছের কথাটা জানিয়ে অভিযানের সঙ্গী হতেও বলেছিলাম । কিন্তু প্রস্তাবটা শুনে ও এত ভয় পেয়েছিল, মনে হয়েছে ওকে যেন 'মৃত্যু-কূপে' ঝাঁপ দিতে বলা হচ্ছে । নিজে তো রাজী হলই না, আমাকেও নিবৃত্ত করার চেষ্টা করতে লাগল । ওর বক্তব্য ওখানে গেলে কেউ আর ফিরে আসে না । ওদেরই দু' একজন অবাধ্য হঠকারী নাকি যাবার চেষ্টা করে নিরুদ্দেশ হয়েছে, তাদের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি ।

বুঝলাম, পিংলা প্রাণ থাকতেও আমার সঙ্গী হবে না । কিন্তু আমার সংকল্পও টললো না । অগত্যা কাউকে কিছু না জানিয়ে একদিন দিনের বেলা একেবারে একা ড্রাগন পাহাড়ের দিকে যাত্রা শুরু করলাম ।

ক্যাপ্টেন সিং তাঁর সাহসী অভিযানের কাহিনী শুরু করলেন । আমাদের কৌতূহল তখন আরও তীব্র হয়ে উঠেছে ।

ক্যাপ্টেন সিং-এর ভাষায়—পাহাড়ের কাছাকাছি যখন এসে পৌঁছলাম প্রকৃতিতে সন্ধ্যের ঘোর নেমেছে । একটু আগেই সূর্য অস্ত

গেছে। অন্ধকার নেমে আসছে পাহাড় ডিঙিয়ে। জায়গাটা অদ্ভুত স্তব্ধ। কোথাও কোন জনপ্রাণী নেই। একটা সম্বর কিংবা কাঠ-বিড়ালীও চোখে পড়ল না কোথাও। মনে পড়ল পিংলার সাবধান বাণী—'ড্রাগন পাহাড় সবার কাছেই নিষিদ্ধ এলাকা।'

হাতে টর্চ, কাঁধে বন্দুক নিয়ে পাহাড় ভেঙে এগিয়ে চললাম ড্রাগন পাহাড়ের আরও ভেতর দিকে। ফার আর পাইনের জঙ্গল দূরে মাথা নাড়াচ্ছে। মনে হল ওরাও যেন আমায় নিষেধ করতে চায়। ড্রাগন পাহাড় মানুষের জন্যে নয়, অন্য দেবতার আশ্রয়স্থল।

কতক্ষণ হেঁটেছিলাম খেয়াল নেই। একটা পাহাড়ী উপত্যকার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছিলাম··· ।

হঠাৎ কানে এল এক অদ্ভুত গর্জন। সে আওয়াজের সঙ্গে কোন কিছুরই তুলনা চলে না। অমন গর্জন কোনদিন শুনি নি আমি। সিংহের গর্জন তার কাছে তুচ্ছ, বরং কালবৈশাখীর রাতে যখন বজ্রপাত হয় সে ভয়ঙ্কর আওয়াজের সঙ্গে সেদিনের শোনা গর্জনের কিছুটা তুলনা মেলে। আমি চমকে তাকালাম। দূরে সমস্ত পাহাড়ী উপত্যকাটা জুড়ে ওটা কি? সামনে পাহাড়। পথ বন্ধ করে ওটা কি কোন পাহাড়-প্রাচীর? কিন্তু একটু আগেই পথ খোলা দেখেছি, তবে এক্ষুনি ও পথ বন্ধ হয়ে গেল কি করে? আবার সেই গর্জন···মনে হল সামনের ওই পাহাড় থেকেই গর্জনটা ভেসে আসছে···একটু বাদে ওটা সম্পূর্ণ-ভাবে দৃষ্টিসীমায় এল। অন্ধকারটা সরে যেতে বুঝলাম, সামনের ওটা কোন চলন্ত পর্বত নয়—পর্বতপ্রমাণ উঁচু এক অদ্ভুত প্রাণী। অনেকটা সরীসৃপের মতো চেহারা তবে তুলনায় অনেকগুণ বড়। পেছনের দুটি পা ও ল্যাজে ভর দিয়ে হেঁটে আসছে। সামনের পা দুটি সেই অনুপাতে ছোট। মুখটা লম্বাটে। হাঁ করতেই লম্বা জিভটা বেরিয়ে আসছে ঘন ঘন। সমস্ত জন্তুটার আয়তন অন্ততঃ ষাট ফুটের কম হবে না। গর্জনটা আবার শোনা গেল। সেটা বেরিয়ে আসছে ওই ভয়ঙ্কর জানোয়ারটার গলা থেকে।

মেঘনাদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ক্যাপ্টেন সিং-এর প্রতিটি কথা ও যেন গোগ্রাসে গিলে চলেছে। কিন্তু এ কোন্ অবিশ্বাস্য কাহিনী শোনাচ্ছেন ক্যাপ্টেন সিং।

ক্যাপ্টেন আর একটা সিগারেট ধরিয়ে টান মেরে আবার শুরু করলেন—

জানোয়ারটা সামনের দিক থেকে আমার কাছে ক্রমশ এগিয়ে আসছে। এগোবার উপায় নেই। এক মাত্র পথ পশ্চাৎ অপসারণ। একটা বন্দুকের গুলি জানোয়ারটার কোন ক্ষতি করতে পারবে বলে মনে হল না, তার আগেই ও আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

মনে পড়ল শিনকি গিরি উপত্যকার পাহাড়ী আদিবাসীদের বিশ্বাসের কথা। ওরা জীবন্ত ড্রাগন দেবতার পুজো করে। সেই দেবতা এবং তার বাহনের আস্তানা ড্রাগন পাহাড়ে। এই কি তবে সেই ড্রাগন ?

জানোয়ারটা বোধহয় ততক্ষণে আমায় দেখতে পেয়েছে। ঘন ঘন ল্যাজ আছড়াচ্ছে, সেই সঙ্গে প্রচণ্ড গর্জন। সারা পাহাড় কম্পিত করে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। আমার মনের মধ্যে কে যেন চিৎকার করে উঠল—পালাও ক্যাপ্টেন সিং, না পালালে মরণ তোমার কেউ ঠেকাতে পারবে না।

আমাদের দূরত্ব কমে আসছে···আরো··· আরো।

শেষ পর্যন্ত আমাকে পালাতেই হল মেঘনাদ ভাইয়া, কারণ এক্ষেত্রে পাল্টা আক্রমণ করতে যাওয়ার একটাই অর্থ—তা, হল আত্মহত্যা।

ক্যাপ্টেন সিং থামলেন। খানিক নীরবতা। তার পর বললেন—ড্রাগন পাহাড় থেকে আমায় পালিয়ে আসতে হয়েছে কিন্তু সেই-দিনই প্রতিজ্ঞা করেছি এ রহস্য উদ্ঘাটন আমি করবোই আর তাই এ ব্যাপারে সবচেয়ে আগে আমার তোমার কথাই মনে পড়েছে মেঘনাদ ভাইয়া।

আমি কিন্তু বিস্ময়ে সত্যিই মূক হয়ে গেছি। ক্যাপ্টেন সিং এতক্ষণ যা বললেন তা যদি মেনে নিতে হয় তবে পৃথিবীতে ড্রাগন অস্তিত্বকে সত্যি বলে স্বীকার করে নিতে হবে। ষাট ফুট লম্বা, সরীসৃপজাতীয় জীবের বর্ণনার সঙ্গে ড্রাগনের অনেকটাই মেলে কিন্তু তাই বলে রূপকথার জগৎ যদি বাস্তবে সত্য হয়ে ওঠে তবে তো মানুষের বাস্তব ধ্যান-ধারণাগুলো প্রচণ্ড ভাবে আহত হবে। তবে কি মেঘনাদ সেদিন ট্রেনে যা বলেছিল তেমন কোন প্রাণীর সত্যিই আবির্ভাব ঘটেছে এই বিংশ শতাব্দীতে? সেই প্রাগৈতিহাসিক বিশালাকৃতি টাইরানোসরাস বা স্টেগোসরাসের মতো জানোয়ার? কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব? তারা তো পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে আজ থেকে অন্ততঃ ছ' কোটি বছর আগে।

মেঘনাদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ও গভীর চিন্তায় মগ্ন।

ক্যাপ্টেন সিং বাইরের দিকে তাকিয়ে সিগারেটের ধোঁয়ার একটার পর একটা রিং ছেড়ে যাচ্ছে।

বেশ কয়েক মিনিট কেটে গেল এই ভাবে। আমার কাছে মুহূর্ত-গুলো অস্বস্তিকর।

হঠাৎ মেঘনাদ মাথা তুলল। ক্যাপ্টেন সিং-এর দিকে পূর্ণ দৃষ্টি মেলে বলল—শিনকি উপত্যকা এখান থেকে কত ঘণ্টার রাস্তা ক্যাপ্টেন সিং?

—সেটা পথের অবস্থার ওপর নির্ভর করে। ধ্বস পড়ে পাহাড়ী পথ যদি বন্ধ হয়ে না যায় তাহলেও একটা দিন তো লাগবেই। মেঘ-নাদের আগ্রহ লক্ষ্য করে ক্যাপ্টেন সিং-এর চোখ দুটোও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

—আপনি জীপের ব্যবস্থা করুন। সম্ভব হলে আজই আমি যাত্রা করতে চাই। মেঘনাদ এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো উচ্চারণ করে উঠে দাঁড়াল।

পাঁচ

[যাত্রা হল শুরু]

সিমলা ছাড়লাম পর দিন সকালে। আগের দিনটা সমস্ত গোছগাছ করতেই সময় কেটে গেল। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে যাবার উপযোগী কয়েকটি প্রয়োজনীয় সামগ্রী সঙ্গে নিল মেঘনাদ। তার মধ্যে অবশ্যই আছে আমাদের দুজনের জন্যে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র—রিভলবার। আদিবাসীদের জন্যে নানা রঙচঙে এবং স্প্রিং-এর খেলনা কিনলো মেঘনাদ আর সেই সঙ্গে ফিলিপ্‌স্ কোম্পানীর একটা অলওয়েভ রেডিও ট্রানজিস্টার। এটা এ অভিযানে মিছিমিছি সঙ্গে নেওয়া হল বলে মেঘনাদকে তখন কথা শুনিয়েছিলাম বটে কিন্তু সত্যিকারের কত উপকার যে সেটা করলো তা বুঝলাম আরও কদিন পরে। সে কথা যথাসময়ে বলবো।

আমার কিন্তু এভাবে তাড়াহুড়ো করে সিমলা ছেড়ে যাবার ইচ্ছে মোটেই ছিল না বরং ভেবেছিলাম দু'একদিন এখানে থেকে হিমাচল প্রদেশের রাজধানী এই পার্বত্য নগরীর সৌন্দর্যের স্বাদ অন্ততঃ কিছুটা উপভোগ করি।

কিন্তু মেঘনাদ জোর তাগাদা লাগাল। অগত্যা মনের ইচ্ছে মনেতেই চেপে রাখতে হল।

ঠিক সকাল সাতটা নাগাদ ক্যাপ্টেন সিং-এর মিলিটারী জীপ আমাদের নিয়ে সিমলা থেকে যাত্রা শুরু করল।

আমাদের এবারে লক্ষ্য কার্টরোড ধরে নারকান্দার ওপর দিয়ে সুদূর শিনকি উপত্যকা।

জীপের স্টিয়ারিং হুইল ধরেছিলেন ক্যাপ্টেন সিং নিজেই। কয়েক

মাইল রাস্তা যেতেই বুঝলাম ক্যাপ্টেন সিং একজন সুদক্ষ চালক।

দুর্গম পাহাড়ী চড়াই উৎরাইয়ের পথ ধরে তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে আমাদের জীপ। যাত্রাপথে কোথাও রুক্ষ পাহাড়। পাহাড়ভাঙা সরু রাস্তা। রাস্তার পাশেই গভীর খাদ। গাড়ি কোন রকমে বেসামাল হলেই পাহাড়ী খাদে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পথের ধারে কোথাও বা পাইনের জঙ্গল। দূর থেকে মনে হয় পাহাড়গুলোর ওপর যেন প্রকৃতি সবুজ কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে।

আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছিলাম প্রকৃতির অপূর্ব বন্য রূপ। শহর-জীবনের নানা সমস্যায় বিব্রত জীবন এই মুহূর্তে যেন দুঃস্বপ্নের স্মৃতি মাত্র।

—ক্যাপ্টেন সিং ড্রাগন পাহাড়ের রহস্য আপনাকে ঠিক কবে থেকে প্রথম ভাবাতে শুরু করল বলতে পারেন? মেঘনাদের কথায় আমার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল।

—সে প্রায় বছর খানেক আগেকার কথা। স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে সামনে পথের দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন সিং বলতে লাগলেন—আমাদের মিলিটারীর একজন টহলদার জওয়ান মহীন্দরলাল জনশূন্য পাহাড়ী এলাকায় এক আদিবাসী যুবকের সন্ধান পায়। যুবকটি উদ্‌ভ্রান্তের মতো একা নিঃসঙ্গ ঘুরে বেড়াচ্ছিল পাহাড়ে পাহাড়ে। মহীন্দরলালকে দেখে সে পালাবার চেষ্টা করে কিন্তু মহীন্দর তাকে চটপট গ্রেফতার করে আমার কাছে নিয়ে আসে। যুবকটিকে আমার অদ্ভুত মনে হয়েছিল।

—কেন?

—প্রথমতঃ আদিবাসী এলাকার মানুষ হয়েও কি এক অজ্ঞাত কারণে তার নিজেদের গ্রামে প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত, তাই পাহাড়ে একা ঘুরে বেড়াচ্ছিল উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায়। দ্বিতীয়তঃ যুবকটিকে যেন কি এক ভয়ঙ্কর আতঙ্ক সর্বক্ষণ তাড়া করে বেড়াচ্ছিল, তাই কোন কিছু বলা তো দূরের কথা, কিছু জিজ্ঞেস করলেই সে যেন শিউরে

উঠছিল। সম্ভবতঃ সঙ্গে সঙ্গে তার অতীত স্মৃতির কোন চিত্র চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। আমি অনেক চেষ্টা করেও তার মুখ থেকে কিছু বার করতে পারিনি, তবে এটুকু বুঝেছিলাম ও আসছে ড্রাগন পাহাড়ের ওপার থেকে। হয়তো ওখানকার আদিবাসী প্রথায় ওকেও কোন এক বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে ড্রাগন দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়েছিল। জীবন্ত ড্রাগন দেবতার বাহন ওকে হয়তো নিয়েও গিয়েছিল ড্রাগন পাহাড়ের ওপারে কিন্তু যে কোন ভাবেই হোক সে পালিয়ে আসতে পেরেছে, তবু আতঙ্ক ওকে তাড়া করে বেড়িয়েছে।

—যুবকটি আছে এখনও? মেঘনাদ সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে।

—না হে। ক্যাপ্টেন সিং বললেন। ক্রমাগত ভয় আর আতঙ্কে ওর মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছিল। ওকে আমি আমাদের মেডিকেল ট্রিটমেন্টে রেখে সারিয়ে তুলবো ভেবেছিলাম, কিন্তু তা আর হল না। কদিন পরে কোন এক ফাঁকে আমাদের ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে যায়। তারপর ওর দোমড়ানো থেঁতলানো দেহটা পাওয়া যায় পাহাড়ী খাদের ভেতর। বোধহয় বিভীষিকায় দিশেহারা হয়ে গিয়ে ছুটোছুটি করতে গিয়ে খাদে পড়ে গিয়েছিল। ক্যাপ্টেন সিং একটু থেমে বললেন, এই আশ্চর্য ঘটনাটাই ড্রাগন পাহাড় ঘিরে দীর্ঘদিনের গুজব সম্পর্কে প্রথম কৌতূহলী করেছিল। পরের ঘটনা সবই তো আগে আপনাদের বলেছি।

মেঘনাদ পকেট থেকে অন্যমনস্ক ভাবে একটা সিগারেট বার করে বলল—সেই আদিবাসী ছেলেটা সত্যিই আচমকা খাদের মধ্যে পড়েই মারা গেছে বলে আপনার বিশ্বাস ক্যাপ্টেন সিং? মানে ব্যাপারটা নিছকই দুর্ঘটনা এবং এর মধ্যে অন্য কোন হাত নেই বলে মনে করেন?

সামনে বিপজ্জনক পাহাড়ী বাঁক। সেটা অতিক্রম করে ক্যাপ্টেন সিং একবার মাথাটা ফেরালেন তারপর দৃষ্টিটা আবার সামনের পথে রেখে বললেন—সে সময় এর বেশি কিছু ভাবতে পারি নি, তবে প্রকৃত

রহস্যের সন্ধান মিললে হয়তো অনেক অজানা তথ্যও জানা যেতে পারে।

মেঘনাদ আর কোন কথা বলল না। ও চুপচাপ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে। কিন্তু আসলে কি বলতে চায় মেঘনাদ?

গত বছরে ড্রাগন পাহাড় থেকে পালিয়ে-আসা সেই পাহাড়ী ছেলেটার এই মৃত্যুকে কি সে দুর্ঘটনা বলে মেনে নিতে পারছে না? কিন্তু কেন? আমি জানি এই মুহূর্তে প্রশ্ন করলেও মেঘনাদের কাছ থেকে সঠিক জবাব পাওয়ার আশা নেই।

অগত্যা চোখ দুটো রাখলাম জীপের বাইরে পাহাড়ী বন্য সৌন্দর্যের দিকে। কিন্তু মন? সেখানে একসঙ্গে অনেক কথা ভেসে উঠতে লাগল। কোন্ অজানা রহস্যের সন্ধানে চলেছি আমরা! সেখান থেকে কোন দিন ফিরতে পারবো তো?

ছয়

[আদিবাসী ঢাক]

দুর্ভেদ্য বনাঞ্চল শিনকি উপত্যকার আদিবাসী গ্রাম থেকে বেশ কয়েক কিলোমিটার দূরে ক্যাপ্টেন সিং-এর সামরিক ছাউনি।

আমরা গিয়ে পৌঁছলাম সন্ধ্যা নাগাদ। অনেকটা পাহাড়ী পথ জীপে আসতে হয়েছে। মাঝে বিশ্রামের কিছু ফুরসত অবশ্য দু'এক জায়গায় মিলেছে কিন্তু তবু শরীর বড় ক্লান্ত।

শিনকি উপত্যকার বনাঞ্চল যেন প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর এক আদিম স্মৃতি নিয়ে বিরাজ করছে। সভ্যমানুষের পদচিহ্ন এ অঞ্চলে খুব বেশি পড়ে নি। অজানা অদ্ভুত কত রকম গাছ-গাছালি লতাগুল্ম পরস্পর জড়াজড়ি করে যেন রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে আছে কি এক আদিম সংকেত বুকে নিয়ে। পাহাড়ী জলধারাগুলির স্রোত প্রচণ্ড।

আমরা সামরিক ছাউনিতে পৌঁছবার সময়ই শুনতে পেলাম দূরে একসঙ্গে অনেকগুলি জংলী ঢাকের আওয়াজ।

ক্যাপ্টেন সিং বললেন, জংলী ওঝা 'দেবীরানী' ড্রাগন দেবতার পুজো করছেন। সারাটা বৈশাখ মাস নাকি সন্ধ্যে থেকে এরকম পূজো অর্চনা চলে। প্রথামতো এই মাসেরই বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে জীবন্ত ড্রাগন দেবতাকে নিবেদন করা হয় একটি তাজা আদিবাসী তরুণকে।

সেদিন সারাটা রাত ভালভাবে ঘুমোতে পারি নি আমি। যদিও ক্যাপ্টেন সিং সামরিক ছাউনির ভেতর তাঁর তাঁবুর পাশেই আমাদের শোবার সুবন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন।

মেঘনাদ কিন্তু বিছানায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। যাকে বলে সশব্দে

ঘুম। ওর নাকের ভেতর থেকে নানা ধরনের সংগীত ভেসে আসছিল।

আমি ঘুমোতে পারছিলাম না। তন্দ্রার ঘোরে বেশ কয়েক বার দুঃস্বপ্ন দেখেছি। একবার দেখলাম—আদিবাসী ওঝা দেবীরানী হাতে একটা ভয়ঙ্কর বর্শা নিয়ে ছুটে আসছে আমার দিকে। এলোমেলো চুলগুলো তার বাতাসে উড়ছে, চোখ দুটো ঘোলাটে লাল, মুখে বিষাক্ত হাসি। কাছে আসতেই আমি চিৎকার করতে গেলাম, কিন্তু দেখি সেটা আর ওঝা দেবীরানী নয়—একটা হিংস্র ড্রাগন। বুকে হেঁটে সে ক্রমেই এগিয়ে আসছে আমার আরো কাছে, মুখ দিয়ে তার ঝলকে ঝলকে বেরুচ্ছে আগুন···। ঘুম ভেঙ্গে গেল আমার, সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। তারপর যতবারই ঘুমোবার চেষ্টা করেছি ঘুম আর আসে নি। মনটা কি আমার এত সহজেই দুর্বল হয়ে পড়লো?

তাঁবু থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছি। চারদিকে আবছা অন্ধকার। শুক্ল পক্ষের জ্যোৎস্নার হালকা আলো ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়ের দূর বনাঞ্চলে, কিন্তু কি শীত রে বাবা। যদিও যথেষ্ট গরম জামাকাপড় পরে রয়েছি তবু ঠাণ্ডা যেন বশ মানছে না।

সেই সঙ্গে দূর থেকে ভেসে আসছে ঢাকের আওয়াজ—দুম···দুম ··দুম···দুম···। সারাটা বৈশাখ মাস ধরে ওই আদিবাসী গোষ্ঠীর উৎসব চলে। এত দূর থেকেও দেখতে পেলাম সে অঞ্চলের আকাশটা লাল হয়ে রয়েছে। হয়তো রাশি রাশি মশাল জ্বলছে সেখানে।

কিছুক্ষণ সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ফিরে এলাম তাঁবুর মধ্যে।

মেঘনাদ তখনও ঘুমে অচৈতন্য।

সাত

[আদিবাসী তরুণ পিংলা]

পরদিন সকালেই ক্যাপ্টেন সিং এক জংলী আদিবাসী তরুণকে নিয়ে তাঁবুতে প্রবেশ করলেন।

ছেলেটির বছর কুড়ি বয়স। এ অঞ্চলের আদিবাসী গোষ্ঠীর মতো হলদেটে গায়ের রঙ, চোখ দুটো ছোট ছোট, ঠোঁট পাতলা, ছিপছিপে গড়ন। পরনে ভাল্লুকের চামড়ার পোশাক, গলায় হাড়ের মালা, হাতে একটা টাঙ্গি।

ক্যাপ্টেন সিং ওর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, এই এলাকায় এ আমার সব থেকে বড় বন্ধু। নাম পিংলা।

ছেলেটি দুপাটি দাঁত বার করে হেসে আমাদের অভিবাদন জানালো।

পিংলা নামটা শুনেই মনে পড়লো—ক্যাপ্টেন সিং যার কথা বলেছিলেন। যে তাঁকে শিনকি গিরি উপত্যকার ওই আশ্চর্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের অনেক গোপন তথ্যের সন্ধান দিয়েছে।

মেঘনাদ পিংলাকে কয়েকটা উপহার দিল—স্প্রিং দেওয়া ভাল্লুক, মোটর গাড়ি, চামড়ার ডুগডুগি।

পিংলা অবাক হয়ে সেগুলো দেখছিল আর খুশিতে হেসে উঠছিল।

আদিম বন্য এই মানুষগুলো স্বভাবে ভারী সরল আর হাসিখুশি।

ক্যাপ্টেন সিং কাজ চালাবার মতো কিছু কিছু ইংরেজী শব্দও তাকে শিখিয়েছেন। অন্ততঃ ভাব বিনিময়ের অসুবিধে বিশেষ হয় না।

ক্যাপ্টেন সিং মেঘনাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, পিংলাকে আরো বশ করতে পারলে আমরা আরো অনেক কিছু জানতে পারবো। অন্ততঃ দো-ভাষীর কাজটা তো আমরা এখনই অনায়াসে ওকে দিয়ে চালাতে পারি।

মেঘনাদ কোন উত্তর দিল না। পিংলাকে ও ভালভাবে লক্ষ্য করছিল।

আট

[মেঘনাদের মারাত্মক শর্ত]

বিকেলে ক্যাপ্টেন সিং-এর তাঁবুতে চা-চক্র চলছিল। হঠাৎ মেঘনাদ বলল—ক্যাপ্টেন সিং আপনি যদি সত্যিই ড্রাগন পাহাড়ের রহস্যের সমাধান চান তবে একটা বিশেষ ব্যাপারে আমাকে সহযোগিতা করতে হবে।

—অবশ্যই। কি করতে হবে বলুন? ক্যাপ্টেন সিং উন্মুখ হয়ে বললেন।

—শিনকি উপত্যকার ওই পাহাড়ী উপজাতিদের গ্রামে আমার আর অর্ণবের কয়েকটা রাত থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

—তার মানে! কি বলছেন আপনি? ক্যাপ্টেন সিং চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন।

—হ্যাঁ ক্যাপ্টেন সিং। এখানে অনেক কিছুই আমায় জানতে হবে। সবচেয়ে আগে আমার জানা দরকার ওই আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রকৃত জীবনধারা এবং তার মধ্যে রহস্যের সূত্রটা কোথায়। মেঘনাদ বলল।

—সেটা কত বড় অসম্ভব তা আপনি ভেবে দেখেছেন মেঘনাদ ভাইয়া? ক্যাপ্টেন সিং মাথা নাড়লেন।

—এই অসম্ভবকেই তো সম্ভব করতে হবে ক্যাপ্টেন। আমার বিশ্বাস খুব একটা বেগ পেতে হবে না, যদি পিংলা এ ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতা করে।

—পিংলা?

—হ্যাঁ পিংলা।

—কিন্তু মেঘনাদ ভাইয়া···।

ক্যাপ্টেন সিং-এর ইতস্ততঃ ভাব দেখে মেঘনাদ বলল—পিংলাকে দিয়ে কাজ হাসিল করার দায়িত্বটা আমিই নিলাম। আপনি শুধু আমাকে আমার প্রয়োজন মতো সাহায্য করবেন।

ক্যাপ্টেন সিং অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন এই দুঃসাহসী যুবকটির দিকে। মেঘনাদের কণ্ঠস্বর কিন্তু অত্যন্ত আত্মপ্রত্যয়ী। ক্যাপ্টেন সিং-এর চোখে চোখ রেখে মেঘনাদ বলল—ড্রাগন পাহাড়ের রহস্যের যবনিকাপাত যদি সত্যিই চান আমার শর্ত আপনাকে মেনে নিতে হবে ক্যাপ্টেন।

ক্যাপ্টেন সিং কিছুক্ষণ কোন কথা বললেন না। তারপর তাঁর ডান হাতটা মেঘনাদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—আমি রাজী।

দুটি বলিষ্ঠ হাত পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলো।

নয়

[অসম্ভবও সম্ভব হ'ল]

সত্যি বাহাদুরী আছে মেঘনাদের। যা স্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারে নি সেই অসম্ভব ব্যাপারকেও কত সহজে সে সম্ভব করে ফেলতে জানে।

পিংলাকে বশ মানিয়ে ও প্রবেশ করেছিল শিনকি উপত্যকার সেই বিশেষ গ্রামটিতে। গ্রামের আদিবাসীদের সর্দার থিংডনের সঙ্গে দেখাও করেছে। অবশ্য যত সহজে বলা হল কাজটা মোটেই তত সহজে হয় নি। প্রথমটা থিংডন কিছুতেই মেঘনাদের সঙ্গে দেখা করতে রাজী ছিল না। এজন্যে অনেক কায়দা অনেক ছল চাতুরী করতে হয়েছে। এ ব্যাপারে আবার মেঘনাদ কাজে লাগিয়েছে সর্দার থিংডনের একমাত্র তরুণ ছেলে তাজুকে। তাজু পিংলার অভিন্নহৃদয় বন্ধু। সেই শেষ পর্যন্ত থিংডনের সঙ্গে মেঘনাদের সাক্ষাৎকারটা ঘটিয়ে দেয়।

বেঁটেখাটো বলিষ্ঠ চেহারা সর্দার থিংডনের। বয়েস যথেষ্ট হলেও শরীরের একটা পেশীও শিথিল হয় নি। পরনে ভাল্লুকের চামড়ার পোশাক, গলায় হাড়ের অলংকার, হাতে টাঙ্গি।

থিংডনকে শেষ পর্যন্ত বশ মানালো মেঘনাদের আনা ফিলিপস্ কোম্পানির সেই ট্রানজিস্টার রেডিও সেটটা। এমন ভূতুড়ে কলের গান সে তার এতখানি জীবনে কখনও শোনে নি। মেঘনাদ যখন ট্রানজিস্টারের সুইচ অন করল, ওর ভেতর থেকে আওয়াজ শুনে প্রথমটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল উপজাতায় সর্দার। তারপর মেঘনাদ যখন ধীরে ধীরে ভয় কাটিয়ে দিল, তখন সে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল রেডিও

সেটটার দিকে তারপর সাষ্টাঙ্গে শুয়ে অভিবাদন জানাল ওটাকে। সর্দারের দেখাদেখি সেখানে অন্য যারা ছিল তারাও সেই একই আচরণ করল। এরপর মেঘনাদ যখন থিংডনকে গোটা রেডিওটাই উপহার দিতে চাইল, থিংডন তখন আনন্দে উত্তেজনায় হৈ চৈ শুরু করে দিল। দেখতে দেখতে ছুটে এল গ্রামের আর সব আদিবাসীরা। সে যেন এক উৎসবের ধূম। থিংডন নিজে রেডিওটা চালিয়ে দেয়—সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে ট্রানজিস্টারটার দিকে। তাদের দুচোখে ভয় আর বিস্ময় জড়ানো। কিন্তু থিংডনের ভয় কেটে গেছে। তার দুচোখে আনন্দ, আর সেই সঙ্গে মেঘনাদের প্রতি এক অদ্ভুত কৃতজ্ঞতা। এমন জিনিসটি উপজাতীয় দলপতির অহঙ্কার তার প্রজাদের কাছে অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। কত সরল এদের মানসিক গঠন। আমি আশ্চর্য হয়ে ভেবেছি।

দেখতে দেখতে মেঘনাদের সঙ্গে ভারী ভাব হয়ে গেল সর্দার থিংডনের।

কিন্তু এত করেও গ্রামের ভেতরে থাকার অনুমতি মিললো না।

ওদের ওঝা দেবীরানীর অনুমতি ভিন্ন এ সুযোগ কিছুতেই তারা তাকে দিতে পারে না।

তাহলে নাকি ড্রাগন দেবতার অভিশাপ নেমে আসবে তাদের ওপর।

কিন্তু মেঘনাদের অভিধানে আজ পর্যন্ত অসম্ভব বলে কোন শব্দ নেই। অবশেষে নানা কায়দায় সর্দারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সুযোগ যেটুকু পাওয়া গেল তা অবশ্য মন্দের ভাল।

আদিবাসী গ্রাম এলাকার বাইরেটায় আমরা থাকতে পারি আর প্রয়োজনে বিশেষ অনুমতি নিয়ে তবেই ঢুকতে পারি গ্রামের ভেতর।

আপাততঃ এ সুযোগটাই বা কম কি ?

শিনকি গিরি উপত্যকায় গ্রাম এলাকাটির বাইরে আমাদের তাঁবু খাটানো হল। তাঁবুর বাসিন্দা আমরা দুজন, আমি আর মেঘনাদ।

ক্যাপ্টেন সিং থাকতে চেয়েছিলেন কিন্তু মেঘনাদ রাজী হয় নি, বলেছে কটা দিন আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন। অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। যখন যেখানে দরকার আপনার সাহায্য ঠিকই নেব।

অগত্যা ঠিক হয়েছে তিনি মাঝে মাঝে এসে আমাদের খোঁজ নিয়ে যাবেন, আর আমাদের খাওয়া থাকার তদারক করবে আদিবাসী তরুণ পিংলা।

দশ

[গভীর রাতে ভয়ঙ্কর গর্জন]

একটা রাত কেটে গেল ছোট্ট তাঁবুটায়। সারা রাত দুচোখে ঘুম নামে নি। জেগে থেকে শুনেছি জংলী ঢাকের আওয়াজ সেই সঙ্গে আদিবাসীদের সমবেত নৃত্য গীতের শব্দ। আকাশে জ্বলেছে দাউ দাউ মশালের আগুন। এইভাবেই কেটে গেছে রাতটা। ভোরের দিকে ঘণ্টা খানেকের জন্যে মাত্র দুচোখের পাতা বুজোতে পেরেছিলাম।

পরের সারাটা দিন কেটে গেল শিনকি উপত্যকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়িয়ে।

পরনে ছিল ভারী গরম পোশাক, মাথায় শীতের টুপী, কাঁধে ঝোলানো ফ্লাস্ক আর কোমরে গুলিভরা রিভলবার। পিংলা খাবারের ব্যাগ হাতে সর্বক্ষণই আমাদের সঙ্গে ঘুরেছে। গত কয়েকদিনের মধ্যেই মেঘনাদের ভারী ভক্ত হয়ে পড়েছে ও। কি করে মেঘনাদকে আরও খুশি করা যাবে কিছুতেই যেন ভেবে পাচ্ছে না। শিনকি উপত্যকার প্রতিটি গাছ, পাথর আর লতাগুল্ম চিনিয়েও যেন ওর শান্তি নেই। ওর কাছ থেকে ইতিমধ্যেই আমরা ওদের গোষ্ঠীর আরও কিছু রহস্য জানতে পেরেছি। বিশেষতঃ ওদের ওঝা দেবীরানী সম্পর্কে। ওদের কাছে তিনি নাকি সত্যিই দেবী-তুল্যা। বাস করেন ওদের গ্রামের উত্তর প্রান্তে ড্রাগন দেবতার বেদীর কাছে ছোট্ট একটা কুঁড়ে ঘরে। তাঁর ব্যক্তিগত চালচলনের খবর কেউ রাখে না। তবে মাঝে মাঝে বেশ কয়েকদিনের জন্য তিনি গ্রাম থেকে উধাও হয়ে যান। তখন কোথায় যান কেউ তা বলতে পারে না। অনেকের

ধারণা উনি নাকি গভীর রাত্রে ড্রাগন পাহাড়ে ড্রাগন দেবতার সঙ্গে কথা বলতে যান। তারপর যখন ফিরে আসেন আশ্চর্য সব জাত্নর গুণ নিয়ে। কারুর অসুখ বিসুখ কিংবা জটিল ব্যাধি তখন তিনি খুবই সহজে ভাল করে দেন।

পিংলার কাছে আমরা অবাক হয়ে শুনেছি ওদের দেবী-রানীর কথা।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমাদের ড্রাগন দেবতার বেদীটা কি?

পিংলা বলেছে, গ্রামের উত্তর প্রান্তে খানিকটা খোলা জায়গায় একটা বড় বেদী আছে। প্রতি শনিবার সন্ধ্যেবেলা সেখানে ড্রাগন দেবতার উদ্দেশ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য, খাদ্য ইত্যাদি রেখে আসি, রাত্রে আমরা কেউ সেদিকে যাই না কিন্তু পর দিন সকালে গিয়ে সেগুলো আর দেখতে পাই না।

ওই বেদীতেই বোধহয় তোমরা ড্রাগন দেবতার উদ্দেশ্যে প্রতি বছর বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রে একজন করে তরুণকে নিবেদন করো?

পিংলা ড্রাগন দেবতার উদ্দেশ্যে মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বলেছে—হ্যাঁ।

—কতদিন যাবৎ চলছে এই প্রথা?

পিংলা মেঘনাদের প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারে না। তার জানা নেই, ও শুধু এইটুকু জানে ড্রাগন দেবতা দেবীরানীকে পাঠিয়েছে তাদের ওঝা করে। আর দেবীরানী আসার পর থেকেই এই পাহাড়ী আদিবাসী সম্প্রদায়ের যা কিছু বাড়বাড়ন্ত। পিংলার ভাষায় সবই দেবীরানীর পয়মন্তরে।

শিনকি উপত্যকা থেকে কিছুটা পথ আরও উত্তরে শুরু হয়েছে ড্রাগন পাহাড়ে যাবার পথ। পথ ওই নামেই। প্রচণ্ড দুর্গম পাহাড়ী চড়াই উৎরাই।

মেঘনাদের ইচ্ছে ছিল দিনের বেলাতেই ড্রাগন পাহাড়ের কিছুটা ভেতর থেকে ঘুরে আসবে। কিন্তু পিংলা কিছুতেই যেতে দিল না।

নিজেদের বিশ্বাস যাই হোক, হিতৈষী ওই আদিবাসী তরুণটির ভালবাসা আর আশঙ্কার বাঁধন ছিঁড়ে সেই মুহূর্তে কিছুতেই যাওয়া সম্ভব ছিল না।

সেই রাত্রেই শুনলাম সেই ভয়ঙ্কর গর্জন। ক্যাপ্টেন সিং যে গর্জনকে বজ্রপাতের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। গর্জনটা ভেসে আসছে অনেকটা দূর থেকে। তবু মনে হল আমাদের তাঁবুটাও কেঁপে উঠছে সেই ভয়ঙ্কর গর্জনে।

মেঘনাদের আগেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। গর্জনের শব্দে সে খাটিয়ার ওপর উঠে বসেছে।

গর্জনটা বেশ কয়েকবার শোনা গেল। পরের পর।

—শিনকি উপত্যকার ড্রাগন দেবতার বাহন। মেঘনাদ ফিস ফিস করে বলল।

আমি বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। কোন জানোয়ারের গলায় এমন ডাক আমি জীবনে শুনি নি।

আদিবাসীদের নাচ, গান, ঢাকের শব্দও হঠাৎ কেমন থমকে গেছে। একটু বাদে গর্জনও থেমে গেল। শিনকি উপত্যকায় নেমে এল অশুভ নিঃশব্দতার এক কালো ছায়া।

সারাটা রাত কেটে গেল এই ভাবে। রাতের স্তব্ধতা ভেঙে একটা বুনো জন্তুর ডাকও আর শোনা গেল না।

এক সময় ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ল শিনকি উপত্যকায়। ড্রাগন পাহাড়ের মাথায় সূর্য উঠল, যেন ড্রাগন দেবতার মুখের গনগনে আগুন ছড়িয়ে।

এগারো

[পিংলা খুন]

একটু বেলায় দৌড়ে তাঁবুতে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন সিং। ঘরে ঢুকেই যে সংবাদটা দিলেন সেটা বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়ল আমাদের কানে।

—মেঘনাদ ভাইয়া, পিংলা খুন হয়েছে।

মেঘনাদ ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে খাচ্ছিল। ক্যাপ্টেন সিং-এর অভাবিত সংবাদের ধাক্কায় মেঘনাদের হাতের কাপ হাত থেকে সশব্দে পড়ে গেল।

—কি বলছেন আপনি ক্যাপ্টেন? আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলাম।

—হ্যাঁ, অর্ণববাবু। আজই ভোরের দিকে একজন টহলদার জওয়ান এখান থেকে প্রায় দু'কিলোমিটার দূরে খাদের মধ্যে ওর দেহটা খুঁজে পেয়েছে। ক্যাপ্টেন সিং উত্তেজিত ভাবে বললেন।

—কিন্তু এটাকে দুর্ঘটনা না বলে আপনি খুন বলছেন কেন ক্যাপ্টেন? মেঘনাদের প্রশ্ন।

—তার কারণ নিছক খাদের মধ্যে পড়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে শুধু-মাত্র তার মাথাটা গুঁড়িয়ে যেত না মেঘনাদ ভাইয়া।

—মাথাটা গুঁড়িয়ে গেছে?

—হ্যাঁ, তাকে সনাক্ত করতে পেরেছি একমাত্র তার গলার সোনালী রঙের চেনটার সাহায্যে। কদিন আগে যা আপনি ওকে উপহার দিয়েছিলেন।

—আমি এক্ষুনি একবার মৃতদেহটা দেখতে চাই—মেঘনাদ উঠে দাঁড়াল।

—হ্যাঁ, চলুন। লাশটা সেখানেই এখনও পড়ে আছে, আমি গিয়ে না পৌঁছলে কেউ তাতে হাত দেবে না।

আমরা তিনজন তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলাম।

পিংলার মৃতদেহটা পড়ে আছে ড্রাগন পাহাড়ে যাবার পথের পাশে এক পাহাড়ী খাদের মধ্যে।

মৃতদেহের শরীরটা মোটামুটি অক্ষত থাকলেও মাথাটা একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। মনে হয় কে যেন গোটা মাথাটাই চিবিয়ে ছিবড়ে করে দিয়েছে। বীভৎস দৃশ্য।

মেঘনাদ কিছুক্ষণ ধরে দেহটা পরীক্ষা করে বলল—ক্যাপ্টেন সিং, আপনি ঠিকই বলেছেন, পিংলাকে হত্যাই করা হয়েছে এবং তা অন্য কোন জায়গায়। এখানে শুধু মৃতদেহটা এনে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

—আপনার এ ধারণার কারণ?

—আপনি নিজেই দেখুন এভাবে একটা মাথা সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দিতে হলে সেখানে কতটা রক্তপাত হওয়া উচিত। এখানে কিন্তু রক্ত খুব বেশি পড়ে নেই।

সত্যিই তাই। পিংলার দেহের আশেপাশে রক্তের ছাপ খুব বেশি নেই।

—কিন্তু পিংলাকে এভাবে কে হত্যা করতে পারে বলে আপনার ধারণা মেঘনাদ ভাইয়া? পিংলার মৃত্যুতে ক্যাপ্টেন সিং খুবই বিচলিত।

—হয়তো ওর কাজকর্ম যার বা যাদের স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করছিল। মেঘনাদের কথায় ওর দিকে তাকাই।

—আদিবাসীরা বলবে এটা ড্রাগন দেবতার অভিশাপ।

—জানি। সে অভিশাপের কবলে আমরাও পড়তে পারি, যদি এখন থেকে আমরা আরও সাবধান না হই।

পিংলার মৃতদেহটা পেছনে রেখে মেঘনাদ ফিরে চলল। সঙ্গে আমরাও।

বারো

[অনুসরণ]

গত কয়েকটা রাত নিদ্রাহীন কাটার পর সে রাতে কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঘুমটা ভেঙে গেল মেঘনাদের হাতের ঝাঁকুনীতে। মেঘনাদ ডাকছে—অর্ণব ওঠ। উঠে পড়। শুনতে পাচ্ছিস?

ঝাঁ ঝাঁ রাত্রির এক অদ্ভুত স্তব্ধতা। পাহাড়ীদের উৎসবের বাজনাও থেমে গেছে। হঠাৎ শুনতে পেলাম সেই পরিচিত প্রচণ্ড গর্জন। যেন কোন পাহাড়ী ধ্বস নামার শব্দ। কিন্তু এ ভয়ঙ্কর শব্দের সঙ্গে তারও কিছু পার্থক্য আছে। ধ্বস অমন থেমে থেমে নামে না।

রাত ক'টা এখন কে জানে। মেঘনাদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওর পরনে গরমের ভারী কোট প্যাণ্ট, মাথায় টুপী পায়ে বুট, তাঁবুর বাইরে বেরুবার জন্যে একেবারে প্রস্তুত।

আমি উঠে বসতেই মেঘনাদ বলল, চটপট তৈরি হয়ে নে। বেরুতে হবে।

—এখন! এত রাতে? আমি ঘুম চোখে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাই।

—হ্যাঁ। এই সময়টাই আমায় বেছে নিতে হয়েছে। একটা রহস্যের মীমাংসা চাই আমি।

কি বলতে চাইছে মেঘনাদ? কিন্তু আমি জানি এসব কথা এখন ওকে প্রশ্ন করে কোন উত্তর পাওয়া যাবে না।

অগত্যা সেই নিস্তব্ধ শীতার্ত রাতে আমাকে মনের সব প্রশ্ন চেপে

বেরুতে হল মেঘনাদের সঙ্গে।

মেঘনাদ এগিয়ে চলেছে আদিবাসী গ্রামের দিকে।

সমস্ত গ্রামটা কাঠের খুঁটির প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। গ্রামে প্রবেশের মাত্র দুটি পথ। একটি শিনকি উপত্যকার দক্ষিণ দিকে, অপরটি উত্তরে। মেঘনাদের গন্তব্য উত্তর প্রবেশপথের দিকে, যার কিছুটা দূর থেকেই শুরু হয়েছে ড্রাগন পাহাড়ের পথ।

ভয়ঙ্কর গর্জনটা এখনও মাঝে মাঝেই ভেসে আসছে ড্রাগন পাহাড়ের দিক থেকে।

কিন্তু কোথায় চলেছে মেঘনাদ? কি উদ্দেশ্য ওর?

মেঘনাদকে প্রশ্ন করতে উদ্যত হতেই মেঘনাদ হঠাৎ আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে পাশের বড় পাথরটার আড়ালে ছিটকে টেনে নিয়ে গেল।

আমি মেঘনাদের দিকে তাকালাম। ও নিজের ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে নীরবে আমায় দেখিয়ে দিল একটু দূরের পথটা।

একটা পায়ে চলা পথ বেরিয়ে এসেছে আদিবাসী গ্রামের উত্তর প্রবেশ দ্বার থেকে।

একটা ছায়ামূর্তি গ্রামটা থেকে বেরিয়ে এসে হেঁটে চলেছে ড্রাগন পাহাড়ের দিকে।

এই গভীর রাতে ওই নিষিদ্ধ পথে কে ও যাত্রী?

মেঘনাদ একটু দূর থেকে সেই মূর্তিকে অনুসরণ করতে শুরু করল। সঙ্গে আমি।

কিছুটা পথ পিছু নিয়েই বুঝতে পারলাম—সামনের ছায়ামূর্তি পুরুষ নয়—নারী।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা সম্ভাবনা মাথায় এল। কথাটা চুপি চুপি মেঘনাদের কানে কানে বললাম। মেঘনাদ মাথা নাড়ল। অর্থাৎ আমার আগেই ও অনুমান করেছে। নারীমূর্তি পাহাড়ী আদি-বাসী গ্রামের ওঝা 'দেবীরানী'।

নারীমূর্তিকে অনুসরণ করে ইতিমধ্যে ড্রাগন পাহাড়ের দিকে বেশ কিছুটা পথ হেঁটে গিয়েছি আমরা। দুর্গম চড়াই উৎরাই প্রতি পদক্ষেপে বাধার সৃষ্টি করছে। হাতের টর্চ পর্যন্ত জ্বালাতে পারছি না, তাতে সামনের নারীর কাছে আমাদের উপস্থিতি প্রকাশ হয়ে পড়বে।

অন্ধকারটা এতক্ষণে চোখে কিছুটা সয়ে এসেছে। নারীমূর্তির পরনে মনে হল ভল্লুকের চামড়ার ভারী পোশাক। মাথায় লোমের টুপী, হাতে গলায় পুঁতির এবং হাড়ের অলঙ্কার, হাতে টাঙ্গি জাতীয় অস্ত্র, আরও কি আছে দূর থেকে ঠিক বোঝা গেল না।

ড্রাগন পাহাড়ের ক্রমশ ভেতর দিকে এগিয়ে চলেছি আমরা।

ভয়ঙ্কর গর্জনটা আবার শোনা গেল। এবার অনেক কাছ থেকে।

দেবীরানীর সঙ্গে দূরত্ব আমাদের ক্রমেই কমে আসছে।

হঠাৎ আমি আর মেঘনাদ একসঙ্গেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেবীরানী তার আগেই দাঁড়িয়ে পড়েছে। গলা থেকে বেরিয়ে এসেছে এক তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ।

ও কি কাউকে সংকেত পাঠালো?

ঠিক সেই মুহূর্তে মনে হল সামনে একটা বিরাট পাহাড় নড়ে উঠল। তারপর দুলতে দুলতে এগিয়ে আসতে লাগলো সামনের দিকে।

ওটা পাহাড় নয়—একটা বিরাট জানোয়ার।

অন্ততঃ ষাট ফুট লম্বা, ঘাড় আর ল্যাজের অংশটা বিরাট, সামনের পা দুটো দেহের অনুপাতে ছোট। পেছনের পা দুটো আর ল্যাজে ভর দিয়ে এগিয়ে আসছে সরীসৃপ জাতীয় ভয়ঙ্কর জীবটা। মুখটা তার সম্বাটে বীভৎস। গলা থেকে মাঝে মাঝেই বেরিয়ে আসছে বজ্রপাতের মত প্রচণ্ড গর্জন।

এর কথাই সেদিন বলেছিলেন ক্যাপ্টেন সিং।

আদিবাসীদের ড্রাগন পাহাড়ের ড্রাগন দেবতার বাহন।

জীবটার আরও কাছে এগিয়ে যাচ্ছে 'দেবীরানী'। বিশাল জীবটার পাশে তাকে আকারে একটা ছোট পুতুলের মতো মনে হচ্ছে।

আমরা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। রাতের গভীরে শিনকি উপত্যকায় এ কি রহস্যময় নাটক অভিনীত হচ্ছে।

ভয়ঙ্কর জীবটা আর একবার গর্জন করে উঠলো, তারপর এগিয়ে এল দেবীরানীর আরও কাছাকাছি।

দেবীরানী হাত তুলল। বলল—বোস ডায়না। আশ্চর্য! দেবী-রানীর কণ্ঠে নির্ভুল বাংলা উচ্চারণ। আর সে আহ্বানে বিশাল জীবটা অত্যন্ত বাধ্য ভঙ্গিতে সামনের পা দুটো নামিয়ে হুড়মুড় করে বসে পড়ল। নিজেদের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছি না—ড্রাগন পাহাড়ের ভয়ঙ্কর দানবটিকে আদর করছে দেবীরানী। গৃহপালিত জীবের মতো ওর মুখে গলায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আর সেই ভয়ঙ্কর জানোয়ার একান্ত অনুগতের মতো পরম তৃপ্তিতে সেই আদরটুকু অনুভব করছে আর মাঝে মাঝে ওর গলা থেকে যে বিচিত্র শব্দ বেরিয়ে আসছে তা আদর আর তৃপ্তির এক মিশ্র আবেশ।

এইভাবে কতক্ষণ সময় কাটলো মনে নেই। আমরা সম্মোহিত হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। একটু বাদে দেবীরানী হঠাৎ জীবটার পিঠের ওপর উঠে বসলো তারপর ওর পিঠে একটা ছোট চাপড় মেরে বলল —চল রে ডায়না। ভাষা বিশুদ্ধ বাংলা।

আমাদের চোখের সামনে পাহাড়ী আদিবাসী ওঝা দেবীরানী শিনকি উপত্যকার ড্রাগন দেবতার বাহনের পিঠে চড়ে ড্রাগন পাহাড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তে মনে পড়ে গেল গত কয়েকদিন আগে পিংলার সেই কথাগুলো—ওদের কারুর কারুর ধারণা দেবীরানী নাকি মাঝে মাঝে কয়েকদিনের জন্য রাতের গভীরে ড্রাগন পাহাড়ে যায় ড্রাগন দেবতার সঙ্গে দেখা করতে। কে জানে হয়তো এসব তথ্য জানানোর

জন্যেই পিংলাকে প্রাণ দিতে হল। ওরা হয়তো বলবে ড্রাগন দেবতার অভিশাপ।

মেঘনাদ আরও এগুতে চেয়েছিল কিন্তু আমি বাধা দিয়েছি। এই অবস্থায় আর এগুনো মানেই মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় ডেকে আনা।

তবে সে রাতে আর একটা রহস্যের মুখোমুখি আমরা হলাম—তা হল এই পাহাড়ী উপজাতি গোষ্ঠীর ওঝা 'দেবীরানী' ওদের সম্প্রদায়ভুক্ত কেউ নয়। সে এক বাঙালী নারী। তার গলার স্বর শুনে এটুকু বুঝতে আমাদের ভুল হতে পারে না।

চির রহস্যাবৃত হিমালয়ের দূর গহন উপত্যকায় পাহাড়ী আদিবাসীদের এলাকায় আরও কত কি বিস্ময় লুকিয়ে আছে কে জানে?

সে রাতের মতো আমরা আবার ফিরে চললাম নিজেদের তাঁবুর দিকে।

মেঘনাদের মুখে একটাও কথা নেই।

তেরো

[মারাত্মক পরিকল্পনা]

আরও দুটো দিন কেটে গেছে।

মেঘনাদ আজ সকালে কিছু না জানিয়ে কোথায় যে বেরিয়েছে এখনও তাঁবুতে ফেরে নি। অথচ দুপুরে খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। পেটে আমার ছুঁচোয় ডন বৈঠক দিচ্ছে। মাঝে মাঝে মেঘনাদটার মাথায় কি যে ভূত চাপে!

আচ্ছা, এখন আমি কি করি! এমন জায়গায় একা বাইরে বেরিয়ে হঠাৎ যদি ও বিপদে পড়ে খবর পাবার পর্যন্ত কোন উপায় নেই। ভাবতে ভাবতে ভেতরটা আমার ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠছে। বিশেষতঃ দেবীরানীকে সে রাত্রে এমন অদ্ভুত পরিবেশে এবং পরিস্থিতিতে দেখার পর থেকে আমার মনের অস্থিরতা যেন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে সব কিছুর মধ্যে একটা গভীর চক্রান্ত আছে। প্রাগৈতিহাসিক ড্রাগন, পাহাড়ীদের ওঝা বাঙালী নারী—কোনটাই স্বাভাবিক বা নেহাত জংলী ঘটনা বলে আর মানতে পারছি না। অথচ এসবের মূল সূত্রটা কোথায় তাও বোঝবার উপায় নেই।

মেঘনাদ গতকাল সেই কথাই বলছিল—বুঝলি অর্ণব, আমি স্থির নিশ্চিত ঐসব কিছুর পেছনে অন্য কোন গূঢ় কারণ আছে। তবে যেটাকে ড্রাগন বলে ভাবা হচ্ছে আমি আজ নিঃসন্দেহে বলতে পারি, সেটা আসলে এক প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী।

সন্দেহটা আমার মনে জাগলেও বহুকাল আগে পৃথিবী থেকে লুপ্ত

সেই প্রাণীর অস্তিত্বের কথা যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

মেঘনাদ বলে চলে—জীব-বিজ্ঞানীদের কাছে ওর পরিচিতি ব্রন্টো-সরাস। ডাইনোসর সরীসৃপ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ট্রেনে আসার সময়ে তোকে এদের কথা বলেছি। পৃথিবীর ইতিহাসের মেসোজোয়িক যুগে অর্থাৎ প্রায় ছ'কোটি থেকে তেইশ কোটি বছর পূর্বে ওরাই সারা পৃথিবীর বুকে দাপটে রাজ্যপাট করতো। তারপর নানা প্রাকৃতিক এবং অন্যান্য বিপর্যয়ে ওরা ধীরে ধীরে পৃথিবী থেকে নিঃশেষ হয়ে যায়।

বললাম, তোর কথা যদি সত্যি হয় তবে আদিম পৃথিবীর এই লুপ্ত প্রাণীটি বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে হঠাৎ আবার আবির্ভূত হয় কি করে?

—সে রহস্য আমি এখনও ভেদ করতে পারি নি অর্ণব, তবে আমার ভাবনাটা বোধ হয় মিথ্যে নয়।

—কিন্তু চিনতে তোর ভুলও হতে পারে।

—না। মেঘনাদ দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করল, ভুল আমি করিনি। গত কয়েক দিন যাবৎ ফিজিক্যাল ফিজিওলজির বইটা আমি তন্ন তন্ন করে পড়েছি। তারপর সে রাত্রে আমি খুব ভাল করে লক্ষ্য করেছি জানোয়ারটাকে। ড্রাগন নামে পাহাড়ীরা যাকে পুজো করে সেটা একটা ডাইনোসর ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। এমন একটি আদিম প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর জীবাশ্ম কয়েক বছর আগে আবিষ্কৃত হয়েছে দক্ষিণ ভারতের গোদাবরী উপত্যকা অঞ্চলে। কলকাতায় গেলে দেখতে পাবি সেই অতিকায় কঙ্কালটি আজও সাজান রয়েছে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সটিটিউটে।

আমি আশ্চর্য হয়ে শুনছিলাম মেঘনাদের অদ্ভুত কথাগুলো। যা কিছু এখানে ঘটছে তা প্রথম থেকেই আমার কাছে অবিশ্বাস্য। অথচ কোনটাই শেষ পর্যন্ত অস্বীকার করতে পারছি না। তাহলে কি এটাও আমায় স্বীকার করে নিতে হবে যে আজ থেকে ছ' কোটি বছর অতীতের এক লুপ্ত প্রাণী আজও চরে বেড়াচ্ছে আজকের পৃথিবীতে, হিমালয়ের পাদদেশে শিনকি উপত্যকায়?

শুধু তাই নয়, দেবীরানী, যে পাহাড়ী আদিবাসীদের এক রহস্যময়ী নারী ওঝা, যে নাকি আবার বাঙ্গালী, রাতের অন্ধকারে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই ভয়ঙ্কর ডাইনোসরের পিঠে চড়ে?

আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি!

এসব কথা মেঘনাদের সঙ্গে হয়েছিল গতকাল রাত্রে। তারপর সকালে উঠে সেই যে ও কোথায় বেরিয়েছে, এখনও ফেরে নি।

অবশেষে আর থাকতে পারলাম না। বাইরে বেরুবার পোশাকটা পরে বন্দুকটা হাতে নিয়ে বেরুবার উদ্যোগ করছি হঠাৎ তাঁবুর দরজাটা নড়ে উঠল।

ভেতরে প্রবেশ করল মেঘনাদ।

আমি বিরক্তি প্রকাশ করে একটা কিছু বলতে যাচ্ছি, তার আগেই মেঘনাদ বলল—আপাততঃ কদিন আমার বিচ্ছেদের জন্য তৈরি হও বন্ধু।

তার মানে?

মেঘনাদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওর চোখ দুটো হাসছে। আমার আর একটু কাছে এগিয়ে এসে বলল—অবশ্য এ তাঁবুটা তুলে ফেলতে হবে, আর তোকেও দিন কয়েকের জন্যে গিয়ে থাকতে হবে ক্যাপ্টেন সিং-এর সামরিক ছাউনীতে।

—আর তুই?

—আমি এখানেই থাকবো।

—এখানে মানে? জমাট শীতের রাতে পাহাড়ী উপত্যকার খোলা চত্বরে? মেঘনাদের কথাগুলো হেঁয়ালী মনে হচ্ছে আমার কাছে।

—ঠিক তার উল্টো। আদিবাসী সর্দারের ভাল্লুকের চামড়ার নরম বিছানায়। হাতের বন্দুকটা তাঁবুর একদিকে ঝুলিয়ে রেখে বেশ নির্বিকার ভাবেই মেঘনাদ বলল।

—দোহাই মেঘনাদ, ব্যাপারটা একটু খুলে বল। এভাবে ক্রমাগত কৌতূহল দমন করে রাখলে আমার ব্রেন-ক্যানসার পর্যন্ত হয়ে যেতে

পারে বলে রাখছি। আমি একথা না বলে পারি না।

আমার কথায় খুব জোরে একচোট হেসে নিল মেঘনাদ। তারপর একটু গম্ভীরভাবে বলল, আসলে কি জানিস, প্রকৃত অভিযান আমাদের এই বারই শুরু হবে। মানসিক প্রস্তুতি গড়ে তোল।

—কি করতে চাস ?

—অভিযানের একটা পথ খুঁজে পেয়েছি।

—পথ ?

—হ্যাঁ। আজ সকালে পাহাড়ী গ্রামে গিয়েছিলাম আদিবাসীদের সর্দার থিংডনের সঙ্গে দেখা করতে। আগামী পরশু বৈশাখী পুর্ণিমা। ড্রাগন দেবতার কাছে সে রাতের নিবেদন সর্দার থিংডনের এক মাত্র তরুণ ছেলে তাজু।

—কিন্তু তার সঙ্গে তোর কি সম্পর্ক ? মেঘনাদ কি বলতে চাইছে আমি বুঝতে পারছিলাম না।

মেঘনাদ কিছুক্ষণ সকৌতুকে আমার রুদ্ধশ্বাস কৌতূহলটি উপভোগ করে ধীরে ধীরে বলল, সর্দার থিংডনকে আমি রাজী করিয়েছি আগামী পূর্ণিমার রাতে ড্রাগন দেবতার বেদীতে শোয়ানো হবে খুব গোপনে থিংডনের ছেলের ছদ্মবেশে আমায়।

—না। আমি চিৎকার করে উঠি। এ কি বলছে মেঘনাদ।

—এ সংকল্প থেকে কেউই আমায় টলাতে পারবে না অর্ণব। এইভাবেই আমি রহস্যের আরও গভীরে পৌছতে চাই। সর্দার থিংডনকে আমি বলে দিয়েছি এ পরিকল্পনা যেন ঘুণাক্ষরেও কেউ টের না পায়। এমন কি ওঝা দেবিরানীও নয়। মেঘনাদের কণ্ঠে অটল দৃঢ়তা।

—কিন্তু সর্দার রাজী হয়েছে ?

—প্রথমে রাজী হতে চায় নি। কিন্তু ধর্ম আর সংস্কার হার মেনেছে একমাত্র পুত্রের ভালবাসার কাছে।

কিন্তু মেঘনাদ, এ তো তোর আত্মহত্যার পথে এগিয়ে যাওয়া।

অশ্রুতে আমার গলা প্রায় ধরে এল।

মেঘনাদ আমার পিঠে হাত রাখলো। তারপর ধীরে ধীরে বলল —জীবনটাকে বাজি রেখেই এ পথে নেমেছি অর্ণব। এ ছাড়া ড্রাগন পাহাড়ের রহস্য উদ্ধারের আর কোন উপায়ই যে আমি খুঁজে পাচ্ছি না বন্ধু। তবে তুই দেখিস এ মরণ খেলায় আমার জয় হবেই। তবে এ ব্যাপারে তোর আর ক্যাপ্টেন সিং-এর ভূমিকাও কিন্তু কম থাকবে না।

কিছুক্ষণ সময় চুপচাপ বসে রইলাম, তারপর একসময় নিজেকে শক্ত করে নিয়ে মেঘনাদের দিকে তাকিয়ে বললাম—আমায় কি করতে হবে বল।

মেঘনাদের চোখ দুটো এবার উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর চেয়ারটা আমার আরো কাছে সরিয়ে এনে বলল—যা বলছি, খুব মন দিয়ে শুনে বুঝে নে।

চোদ্দ

[বৈশাখী পূর্ণিমার রাত]

ড্রিম···ড্রিম···ড্রিম···!!

পাহাড়ী আদিবাসীদের জয়ঢাকের শব্দ এত দূর থেকেও শুনতে পাচ্ছি। ওদিকের আকাশটা লালে লাল হয়ে গেছে—বোধ হয় একসঙ্গে অনেক মশালের আগুনে। আজ বৈশাখী পূর্ণিমার রাত। ড্রাগন দেবতার কাছে আজ ওদের জীবন্ত প্রাণ নিবেদন করার দিন।

কিন্তু আজকের এ অনুষ্ঠানটি এক হিসেবে আরও অনেক রোমাঞ্চকর। আজ প্রাণ উৎসর্গের পালা পড়েছিল সর্দার থিংডনের একমাত্র তাজা তরুণ পুত্র তাজুর। দেবীরানীই প্রতি বছর এই 'পালাব' ব্যাপারটা স্থির করে দেয়। এবার নাকি ড্রাগন দেবতার মন্ত্রপাঠে তাজুর নাম উঠেছে।

মেঘনাদ অবশ্য অন্য কথা বলে। ওর মতে সর্দার থিংডনের ছেলে তাজু ইদানীং আমাদের সম্পর্কে বেশ কিছুটা বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল তাই পিংলার মতোই এবার কৌশলে ওকেও সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু বেছে বেছে তরুণ যুবকদেরই বা শুধু ড্রাগন দেবতার বেদীতে উৎসর্গ করা হয় কেন?

সব প্রশ্নের উত্তর খুব শিগগিরিই পাওয়া যাবে, কারণ সর্দার থিংডনের ছেলে তাজুর ছদ্মবেশে এবার ড্রাগন দেবতার বেদীতে যে নিবেদিত হবে, সে মেঘনাদ।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রাণ নিয়ে সত্যিই সে ফিরতে পারবে তো?

আপাতত আমি আর ক্যাপ্টেন সিং এই গভীর রাতে ড্রাগন

পাহাড়ে প্রবেশ পথের ধারে একটা বড় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে আছি। মাথা থেকে পা পর্যন্ত আমাদের ভারী গরম পোশাকে ঢাকা তবু মনে হচ্ছে কুচি কুচি ঠাণ্ডা ঢুকে আমাদের হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে। যদিও সময়টা বৈশাখ মাস এবং হিমালয়ের পাদদেশে শিনকি উপত্যকায় এখন গ্রীষ্মকাল।

মেঘনাদের জীবন এখন সম্পূর্ণভাবে আমাদের হাতে। ক্যাপ্টেন সিং আর আমার দুজনের পিঠে ঝুলছে রাইফেল, এ ছাড়া কোমরে একটা করে তীক্ষ্ণ ধারাল ছুরিও আছে আমাদের, আর আছে পাঁচ ব্যাটারীর বড় ছুটি টর্চ।

রাত বারটা বাজতেই কথামত আমরা এখানে এসে বসেছি। এখন শুধু প্রতীক্ষার পালা।

ভয়ঙ্কর প্রাগৈতিহাসিক জন্তুটা কিছুক্ষণ আগেই এই পথ ধরে হেঁটে গেছে পাহাড়ী গ্রামের দিকে।

আমি যেন এখান থেকেই মানস চক্ষে দেখতে পাচ্ছি আদিবাসী গ্রামে ড্রাগন দেবতার পূজা অনুষ্ঠান।

দাউ দাউ করে হাজার মশাল জ্বলছে গ্রামের উত্তর প্রান্তে বিরাট পূজা প্রাঙ্গণে। বেদীর আশপাশ ঘিরে শয়ে শয়ে আদিবাসী উদ্দাম-ভাবে নেচে চলেছে জংলী ঢাকের তালে তালে। সামনের বেদীর ওপর হাত পা বাঁধা অবস্থায় শোয়ান রয়েছে সর্দার থিংডনের ছেলের ছদ্মবেশে মেঘনাদকে। সর্দার থিংডন নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে দূর পাহা-ড়ের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠছে নিজেরই অপরাধ বোধ থেকে সেই সঙ্গে অন্য কোন পাপের আশঙ্কায়। তবু মেঘনাদের প্রস্তাবে রাজী না হয়ে পারে নি বুড়ো সর্দার। তাজু যে তার একমাত্র ছেলে।

বেদীর সামনে দুর্বোধ্য ভাষায় একমনে মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছে ওঝা দেবীরানী।

হঠাৎ উত্তরের বন্ধ দরজার বাইরে থেকে এক প্রচণ্ড গর্জন ভেসে এল। শত শত জয়ঢাকের আওয়াজও সে গর্জনের কাছে তুচ্ছ।

মুহূর্তে সমস্ত ঢাকগুলো একসঙ্গে থেমে গেল। ড্রাগন দেবতার বাহন এসেছেন।

দেবীরানী চিৎকার করে নির্দেশ দিলেন।

উত্তর দিকের বিরাট কাঠের দরজাটা খুলে দেওয়া হল।

আবার সেই গর্জন।

দরজাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল বিরাট আকৃতির সেই জন্তটা। উচ্চতা প্রায় ষাট ফুট। মেঘনাদের মতে ছ'কোটি বছর পূর্বে লুপ্ত ডায়নোসরের প্রজাতি ব্রণ্টোসরাস নামধারী প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ার।

খোলা দরজা পথে থপ্ থপ করতে করতে প্রবেশ করল জানোয়ারটা।

ততক্ষণে সবাই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে ড্রাগন দেবতার বাহনকে প্রণাম জানাবার উদ্দেশ্যে।

সে আর একবার গর্জন করে উঠল। থরথর করে কেঁপে উঠল আশপাশের কুঁড়ে ঘরগুলো। আর মেঘনাদ? তার ভেতরটাও কি ততক্ষণে আতঙ্কে শুকিয়ে যায় নি?

দেবীরানী হাত তুললো। ইঙ্গিত করল পোষা জানোয়ারটাকে।

পাহাড়ীদের ড্রাগন দেবতার বাহন এগিয়ে এল ড্রাগন বেদীটার কাছে। আর একবার গর্জন. তারপর মেঘনাদকে তুলে নিল মুখে করে, ঠিক যেন একটা বেড়াল ছানার মতো।

বিরাট ডাইনোসরের মুখে মেঘনাদকে নিশ্চয়ই একটা ছোট পুতুলের মতো মনে হবে।

দেবীরানী আবার হাত তুলে ইঙ্গিত করলো। ড্রাগন দেবতার বাহন পিছু ফিরে আবার ফিরে চললো খোলা দরজা পথে পাহাড়ী আদিবাসী গ্রামের বাইরে।

ততক্ষণে আবার শুরু হয়ে গেছে ঢাকগুলোর প্রচণ্ড আওয়াজ আর সেই সঙ্গে নাচ। এবার তা যেন আরও উদ্দাম।

কল্পনায় ছবি দেখতে দেখতে সময় কাটছিল, হঠাৎ ক্যাপ্টেন সিং আমায় একটা খোঁচা দিলেন—অর্ণববাবু, ওই দেখুন।

পনেরো

[ড্রাগন পাহাড়ের গুহায়]

ক্যাপ্টেন সিং-এর কথায় চমকে তাকালাম। পাহাড়ী গ্রামটার কাছ থেকে এগিয়ে আসছে যেন এক চলমান পাহাড়। রেডিয়াম দেওয়া হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম চারটে বেজে গেছে। তার মানে রাত শেষ হতে আর খুব বেশি দেরী নেই। পূর্ণিমা রাত। তবু জ্যোৎস্নার রঙ যেন বড় মলিন।

দূর থেকে যেটা এগিয়ে আসছে সেটা পাহাড় নয়—সেই প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারটা। এক পা এক পা করে এগুচ্ছে আর ভয়ঙ্কর ভাবে লেজ আছড়ে চলেছে।

হালকা আলোর ছটায় জানোয়ারটাকে আর একটু কাছাকাছি থেকে ভালভাবে লক্ষ্য করলাম—মুখে করে কি একটা বয়ে নিয়ে চলেছে ও। নিশ্চয়ই মেঘনাদ।

কিন্তু ওই অবস্থায় মেঘনাদ বেঁচে আছে তো! যদিও চামড়ার পোশাকের ভেতর আত্মরক্ষার উপযুক্ত বিশেষ ধরনের প্যাড আছে ওর—কিন্তু তবু কার্যক্ষেত্রে তা পারবে তো ডাইনোসরের কামড় থেকে মেঘনাদকে রক্ষা করতে?

—অর্ণববাবু, ক্যাপ্টেন সিং উত্তেজিত ভাবে ফিস ফিস করে বললেন, ইচ্ছে করছে এক্ষুনি ওটাকে পেছন থেকে অ্যাটাক করি!

—পাগল হয়েছেন। আমি বললাম—তাহলে আমাদের সব পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে। আমরা কেউই বাঁচবো না। আপাতত আমাদের যা করণীয় তা হল পেছন থেকে ওকে সন্তর্পণে অনুসরণ করা।

এই ভাবে আমাদের ড্রাগন পাহাড়ের ভেতরে ঢুকতে হবে। আপনার লোকজন সব তৈরি আছে তো?

—হ্যাঁ, তারা আশপাশে লুকিয়ে আছে, সংকেত দিলেই আক্রমণ করবে।

—ঠিক আছে, ওরা এখানেই থাক। চলুন, আমরা দুজনে ওর পিছু পিছু এগিয়ে যাই।

ডাইনোসরটা ততক্ষণে ড্রাগন পাহাড়ের ভেতর দিকে বেশ কিছুটা পথ এগিয়ে গেছে। আমরা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে তাকে অনুসরণ করতে শুরু করলাম।

ইতিমধ্যে পূর্ব আকাশে পাইন বনের মাথায় সূর্য উঠছে। রাঙা আলো ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত শিনকি উপত্যকায়।

ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে প্রকৃতির দৃশ্যাবলী।

এগিয়ে চলেছি পাহাড় ডিঙিয়ে চড়াই-এর পথ ধরে ধীরে ধীরে। সামনের প্রকৃতিতে গাছপালার সংখ্যা কমে আসছে। রুক্ষ পাহাড়ের ফাঁকে মাঝে মাঝে ছোট ঝোপ, কোথাও বা ফার্নের জঙ্গল।

পদে পদে আলগা পাথরের খণ্ডগুলো বাধা দিচ্ছে আমাদের আরও এগিয়ে যেতে। পাহাড়ী ঝর্ণার প্রচণ্ড স্রোতে পা যেন ছিটকে দিতে চায়। যেন কোন নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকে পড়েছি আমরা। গাছ, পাথর, নদী এখানে সবাই যেন পথের প্রহরী। তাই সকলেই একযোগে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। বলতে চায়—আর এগিও না। ড্রাগন পাহাড়ের ভেতরে ঢুকলে সে আর ফিরতে পারে না।

তবু যেতে আমাদের হবেই পথের সব বাধা অতিক্রম করে বিরাট ডাইনোসরের পিছু পিছু।

অনেকটা পথ হেঁটেছি। হাতঘড়ি সময় জানাচ্ছে দুপুর অতিক্রান্ত। শরীর ক্লান্ত, পা যেন আর চলতে চায় না। তবু থামবার উপায় নেই। সঙ্গে শুকনো খাবার আছে। চলতে চলতে তাই কিছু

মুখে দিয়েছি।

জানোয়ারটা একই ভাবে এগিয়ে চলেছে। মুখের মধ্যে একই ভাবে ঝুলে রয়েছে মেঘনাদ। জানিনা ও এখনও জীবিত অথবা মারা গেছে।

মেঘনাদের কথা মনে হতেই আমার ক্লান্তি বেশ কিছুটা দূর হয়ে গেল। নিজের জীবনকে বাজি রেখে সে এত বড় বিপজ্জনক পথে পা বাড়িয়েছে। কেবল সত্যকে উদ্‌ঘাটনের জন্যই। ওকে আমায় বাঁচাতেই হবে। দরকার হলে শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও চেষ্টা করবো।

অজস্র পদক্ষেপে চড়াই উৎরাই ভেঙে চলেছি। এতদিনের চেনা জগৎকে ফেলে এসেছি অনেক আগে। জানিনা এ পথের শেষ কোথায়। এ যেন সত্যিই আদিম পৃথিবীর এক অবলুপ্ত অধ্যায়ে হঠাৎ ঢুকে পড়েছি আমরা। হয়তো আর কোনদিনই ফিরতে পারবো না বিংশ শতাব্দীর চেনা জগতে।

আশ্চর্য। একটা জনপ্রাণী কোথাও চোখে পড়ছে না। ড্রাগন পাহাড়ের পথে চলতে এই ভবঘুরেও গা ছমছম করে।

এবার একটা খরস্রোতা নদী পার হতে হবে। ডাইনোসরটার কাছে এ কোন সমস্যাই নয়। দিব্যি বিরাট বিরাট পায়ে হেঁটে গেল ওপারে। আমরা চিন্তায় পড়লাম। নদীর যা স্রোত একবার ভেসে গেলে আর সামলাতে পারবো না নিজেদের। অবশেষে ঝুঁকি নিতেই হল। নদীর মাঝে মাঝে পাথরের চাঙড়। সেগুলোর ওপর পা রেখেই অতি সাবধানে এগিয়ে চললাম ওপারের দিকে। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল এই বুঝি পায়ের তলার পাথর গেল সরে। প্রতিটি পাথরই প্রতিনিয়ত জলের স্পর্শে পিছল হয়ে আছে, যে কোন সময়ে পা পিছলে যাওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু ভাগ্য বোধহয় আমাদের সহায়। ক্যাপ্টেন সিং আর আমি দুজনেই এক সময় নিরাপদে পৌঁছে গেলাম নদীর ওপারে।

নদীর পর থেকেই শুরু হয়েছে এবড়ো খেবড়ো পাহাড়। অনেক-গুলো গুহাও চোখে পড়ল। কে জানে ওই সব গুহার কোনটার মধ্যে ওৎ পেতে আছে কি বিপদ।

রাইফেল দুটো বাগিয়ে ধরে এবার আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। আর একটা পাহাড় ডিঙ্গালো জন্তুটা।

পাহাড় থেকে নেমেই সামনে আর একটা নেড়া পাহাড়। তার কিছুটা নীচের দিকে এক বিরাট গুহা। গুহার ভেতরটা এখান থেকে চোখে পড়ে না। ওখানে জমাট অন্ধকার।

গুহার সামনে একটা বেশ বড় পাথরের চাঙড়।

ডাইনোসরটা মেঘনাদকে সেই পাথরের চাঙড়ের ওপর নামিয়ে একটা প্রচণ্ড গর্জন করে উঠল।

পাথরের ওপর মেঘনাদের দেহটা পড়ে আছে। প্রাণ আছে কি না বোঝা গেল না।

—অর্ণববাবু, আমার মনে হচ্ছে জন্তুটাকে এবার আমাদের আক্রমণ করা উচিত। কে জানে মেঘনাদ ভাইয়া সত্যিই এখনও বেঁচে আছে কি না।

কথাটা আমার প্রথমে মনে ধরল কিন্তু তারপরই মনে পড়ল মেঘনাদের গতকালের সাবধানবাণী—কোন অবস্থাতেই ডাইনোসরটাকে নিজে থেকে আক্রমণ করতে যাস নি অর্ণব। তাহলে আমার সমস্ত পরিকল্পনাটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তুই শুধু শেষ পর্যন্ত ওটাকে অনুসরণ করে যাবি। আর···

নাঃ, এর শেষ আমাকে দেখতেই হবে। বললাম—ক্যাপ্টেন সিং, ওকে আক্রমণ করে এখন কোন ফল হবে না, তার চেয়ে বরং···

আমার কথা শেষ হবার আগেই লক্ষ্য পড়ল অন্ধকার গুহাটা থেকে দুজন লোক বেরিয়ে এসেছে। ওদের চেহারা এখানকার পাহাড়ী আদি-বাসীদের মতই মোঙ্গলিয়ান ধরনের। দুজনেই বেঁটেখাটো, বলিষ্ঠ, তবে পরনে গরম কাপড়ের প্যান্ট-সার্ট আর ভাল্লুকের চামড়ার সোয়েটার।

এই জনমানবহীন পাহাড়ী অঞ্চলে এমন বিজাতীয় সভ্য পোশাক পরা আদিবাসী সত্যিই আশা করিনি।

ওরা এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল পাথরটার কাছে, তারপর ওদের মধ্যে একজন মেঘনাদের মাথার দিকটা অন্যজন পায়ের দিকটা ধরে নিয়ে গেল গুহার মধ্যে। একটু বাদে একই চেহারা এবং পোশাক-পরিচ্ছদ পরা আর একজন বেরিয়ে এল গুহাটা থেকে। তার হাতে একটা ভারী লম্বা শেকল। একটা শক্ত বগ্‌লস সুদ্ধ সে সেটা পরিয়ে দিল ডাইনোসরটার গলায়। তারপর চেনের আর এক প্রান্ত ধরে হেঁটে চলল পাহাড়টার পেছনে, যেমন ভাবে কুকুরের গলায় চেন বেঁধে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এক সময় ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল পাহাড়টার আড়ালে।

আমরা দুজনেই কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে দেখলাম চোখের সামনের এই অভাবিত দৃশ্যটা। তারপর আমিই প্রথম কথা বললাম—ক্যাপ্টেন সিং, ড্রাগন পাহাড়ের রহস্যের প্রকৃত অধ্যায় এবার বোধহয় শুরু হল। বোঝাই যাচ্ছে কোন উদ্দেশ্যে কিছু মানুষ এখানে একটা ঘাঁটি বানিয়েছে। এই ভয়ঙ্কর ডাইনোসর তাদের পোষা এবং ওঝা দেবী-রানী এদেরই এজেন্ট। আপাতত মেঘনাদ ওদের খপ্পরে। আপনি ফিরে যান ক্যাপ্টেন সিং, যত শিগগির পারেন আপনার লোকজন নিয়ে এসে জায়গাটা ঘিরে ফেলতে বলুন।

—আর আপনি? ক্যাপ্টেন সিং জিজ্ঞেস করলেন।

—আমি ওই গুহার মধ্যে ঢুকবো।

—কিন্তু অর্ণববাবু…!

—এর মধ্যে কোন 'কিন্তু' নেই ক্যাপ্টেন সিং। মেঘনাদকে বাঁচাবার শেষ প্রচেষ্টাটুকু আমায় করতেই হবে। আমার হাতে রাইফেল আছে, সহজে কাবু কেউ আমায় করতে পারবে না। আমি ওই গুহার গোপন রহস্য জানতে চাই। কণ্ঠে আমার দৃঢ়তা।

সে দৃঢ়তাকে অস্বীকার করার সাধ্য ক্যাপ্টেন সিংএর ছিল না।

বললেন—বেশ, আমায় কি করতে হবে বলুন ?

—অন্ধকার নামতে আর বেশি দেরী নেই। আজ রাতের মধ্যেই আপনি আপনার সশস্ত্র লোকেদের এনে এই পাহাড় ঘিরে ফেলবেন। তারপর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমরা যদি গুহা থেকে বেরিয়ে না আসি আপনারা একযোগে গুহা আক্রমণ করবেন। বুঝতে পেরেছেন ?

—তাই হবে। ক্যাপ্টেন সিং মাথা নেড়ে বললেন।—কিন্তু অর্ণববাবু, আমি আবার বলছি, যে পথে আপনি এগোতে চাইছেন মেঘনাদের মতোই তা এক ভয়ঙ্কর পথ। আমার স্থির ধারণা ওই গুহার মধ্যে আছে এক মরণ ফাঁদ।

ক্যাপ্টেন সিং-এর উপদেশ সেই মুহূর্তে আমার কাছে কোন অর্থই বহন করছিল না, কারণ মেঘনাদকে এখানে ফেলে রেখে পালিয়ে যাওয়ার চিন্তাও আমি কখনও করতে পারি না।

ক্যাপ্টেন সিং আর কিছু বললেন না। ওঁর শরীরটা এক সময় মিলিয়ে গেল পাহাড়ের বাঁকে।

এখন আমায় এগোতে হবে সামনের ওই রহস্যময় অন্ধকার গুহাটার মধ্য দিয়ে। ওটা বাইরে থেকে দেখে মনে হয় যেন একটা বিরাট অজগর হাঁ করে আছে।

এক হাতে রাইফেল, অন্য হাতে পাঁচ ব্যাটারী টর্চটা বাগিয়ে ধরে গুহার মধ্যে পা বাড়ালাম।

ষোল

[অন্ধকার গুহাপথে]

গুহার মধ্যে টর্চের আলো পড়ল। বেশ চওড়া, স্যাঁতসেঁতে গুহার মেঝে, দেয়াল, ছাদ। সামনে কতটা পথ গেছে কে জানে! গুহাটা কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। লোকজন নিয়মিতই চলাচল করে মনে হয়। কিন্তু এখন কোথাও কোন শব্দ নেই। গুহার মধ্যে পা দিতেই একরাশ নৈঃশব্দ যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমার ওপর। গাটা ছমছম করে উঠল। একটু থমকে দাঁড়ালাম তারপর টর্চের আলো ফেলে এগিয়ে চললাম আরো ভেতরে।

লম্বা গুহাপথ। অনেকটা পথ হেঁটে এসেছি কিন্তু এখনও গুহার শেষ দেখতে পাই নি।

হঠাৎ পেছনে পদশব্দ। কে যেন দ্রুত এগিয়ে আসছে।

পিছু ফিরতে গেলাম, কিন্তু তার আগেই একটা ভারী ধাতব ডাণ্ডা এসে সজোরে আঘাত করল মাথার পেছনে। এটুকুই শুধু অনুভব করলাম।

চোখের সামনে রাশি রাশি সরষে ফুল। তলিয়ে যেতে লাগলাম চেতনার অন্ধকারে।

শুধু অজ্ঞান হবার পূর্ব মুহূর্তে মনে হল দুটি বলিষ্ঠ হাত আমায় যেন কাঁধে তুলে নিয়েছে।

তারপর আর কিছু মনে নেই।

সতেরো

[বন্দী দশায় বাঙালী খানা]

যখন জ্ঞান ফিরলো সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা!

ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালাম। এ কোথায় শুয়ে আছি আমি? প্রায় অন্ধকার একটা বদ্ধ গুহা। মেঝে, দেয়াল, সব কিছু পাথরের। সিলিং-এ অবশ্য একটা মিটমিটে ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বলছে। কিন্তু ওটুকু আলো যেন অন্ধকারের অস্তিত্বকে আরও প্রকট করে দিয়েছে।

সময়টা দিন না রাত্তির কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ছাদের সিলিং-এর নীচে যে বাতাস চলাচলের জন্যে একটা ছোট্ট ফোকর আছে সে পথে এক চিলতে আলোও ঢুকছে না। আমার হাতঘড়িটাও নেই। ওটা হয় পড়ে গেছে অথবা ওদের কেউ খুলে নিয়েছে।

এতক্ষণে নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়েছি। একটু একটু করে গত সমস্ত ঘটনাগুলো মনে পড়তে লাগলো আমার। সঙ্গে সঙ্গে বুকটা কেঁপে উঠলো। এ কাদের পাল্লায় পড়েছি আমি?

একটা অস্ফুট যন্ত্রণাসূচক শব্দ কানে এল। শব্দটা এই ঘর থেকেই শোনা গেছে। মাথাটা তুলে এদিক ওদিক তাকালাম। এটা আসলে ছোট্ট একটা গুহা। কিন্তু গুহামুখ পাথর দিয়ে বন্ধ। গুহার এক কোণে একজন শুয়ে আছে না? হ্যাঁ, তাইতো। আমারই মতো অন্য কোন হতভাগ্য নিশ্চয়ই।

মাথাটা একটু তুলে চাপা গলায় বললাম, কে ওখানে?

মানুষটা নড়ে উঠলো তারপর আমার চেয়েও চাপা কণ্ঠে বললো,

চুপ, কথা বলিস নি। ওরা টের পাবে। গুহার বাইরেই পাহারা আছে।

মেঘনাদ !

আর একটু হলেই আমি সব কিছু ভুলে আনন্দে প্রায় চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিলাম—মেঘনাদ তাহলে বেঁচে আছে !

কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সংযত করলাম। জীবন এখনও আমাদের ঘোর সংশয়াচ্ছন্ন।

হাত পা বাঁধা ওই অবস্থাতেই গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে গেলাম মেঘনাদের কাছে। মেঘনাদের কোমর আর পা জুড়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। মোটা তুলোর প্যাডও ডাইনোসরের কামড়ের হাত থেকে ওর শরীরের চামড়া সম্পূর্ণ বাঁচাতে পারে নি।

মেঘনাদের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললাম—এ কোথায় এসেছি আমরা বলতে পারিস ? এরা কারা ?

—সম্পূর্ণটা এখনও টের পাইনি। তবে সমস্ত ব্যাপারটাই অদ্ভুত রহস্যময়। হয়তো সে রহস্য জানতে আমাদের আর দেরী নেই।

মেঘনাদ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও রহস্যভেদের চিন্তা ছাড়তে পারে নি। আশ্চর্য মানুষ যা হোক।

বললাম—এখন সময়টা কি বলতে পারিস ? আমি তো কিছু ঠাওর পাচ্ছি না।

—গভীর রাত্রি। মেঘনাদ জানাল।

অর্থাৎ ক্যাপ্টেন সিং নিশ্চয়ই এতক্ষণে তাঁর লোকজন নিয়ে রওনা দিয়েছেন ড্রাগন পাহাড়ের উদ্দেশ্যে। অবশ্য যদি না পাহাড়ী পথের গোলকধাঁধায় পথ হারিয়ে ফেলেন অথবা অন্য কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয়।

গুহা মুখে গুম্ গুম্ শব্দ !

সামনের ভারী পাথরটা সরে যাচ্ছে। ক্রমে প্রবেশপথ সম্পূর্ণ

উন্মুক্ত হল। সন্ধ্যেবেলা দেখা সেই আদিবাসী দুজন গুহার মধ্যে প্রবেশ করলো। একজনের হাতে ট্রেতে খাবার প্লেট, অন্যজনের দু-হাতে দুটি রিভলবার। আমাদের দিকেই তাক করা।

প্লেটের খাবারের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম—ভাত, মাছ, তরকারী, ডাল। পুরোপুরি বাঙালী রান্না।

আদিবাসীটার দিকে তাকিয়ে বললাম—এসব রান্না এখানে কে করলো?

সে আমার বক্তব্য কিছু বুঝলো মনে হল না। দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বললো। তা আমারও বোঝার বাইরে।

আবার একটা কিছু বলতে যাচ্ছি হঠাৎ গুহা মুখ থেকে একটা ভারী কণ্ঠ শোনা গেল: শুধু ভাত তরকারী কেন, আপনাদের জন্যে মোচার ঘণ্ট, করলা শুক্তো এসব আয়োজনও করতে পারি। হাজার হোক আপনারা আমার অতিথি অর্ণববাবু, তারপর বেশ কিছুদিন ঘর ছাড়া।

বুঝতে অসুবিধে নেই। পরিষ্কার বাংলা কথা।

তাকিয়ে দেখি এক বৃদ্ধ ঘরে প্রবেশ করেছেন। বয়স ষাট থেকে আশির মধ্যে যে কোন সংখ্যা হতে পারে। একমাথা সাদা ধবধবে উস্কোখুস্কো চুল, দাড়ি, পরনে ঝলঝলে গরম কাপড়ের পোশাক। চেহারাটা শুকনো হাড্ডিসার। নাকের ওপর পাওয়ারওলা কাঁচের রিমলেশ ফ্রেমের চশমা।

বৃদ্ধ ঘরে ঢুকে প্রথমে আমাদের দুজনের দিকেই ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন তারপর বিচিত্র হাসি হেসে বললেন—বয়সটা কম হলে কি হয় তোমাদের বুকের পাটা আছে স্বীকার করতেই হচ্ছে। এরপর যে আদিবাসীটা আমাদের জন্যে খাবার এনেছিল তাকে দুর্বোধ্য উচ্চারণে কি যেন বললেন।

সে আমার আর মেঘনাদের হাত পায়ের সমস্ত বাঁধন খুলে দিল।

বৃদ্ধ এবার একটা পাথরের স্তূপের ওপর বসে সেই বিচিত্র হাসিটা হেসে বললেন—তোমাদের এখানে এভাবে এতক্ষণ হাত পা বেঁধে ফেলে রাখার জন্য দুঃখিত অর্ণববাবু, মেঘনাদবাবু—কিন্তু এছাড়া আমার আর উপায় ছিল না···বলতে বলতেই হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন, এই দেখ, তুমি বলছি বলে কিছু মনে কোর না যেন, সব দিক থেকে আশা করি সে অধিকার আমার আছে—আর নামের শেষে 'বাবু'টাও বর্জন করি, কি বল—ওটাতে বড় কৃত্রিম মনে হয়।

আমরা কিন্তু একটা কথাও না বলে অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম মানুষটার দিকে। ড্রাগন পাহাড়ের আশ্চর্য গুহায় কে এই বৃদ্ধ? ইনি আমাদের নাম পর্যন্ত জানেন অথচ আমরা এঁর সম্পর্কে কিছুই জানি না।

—পরস্পরকে চেনা জানা নিশ্চয়ই হবে। এত কষ্ট করে যখন তোমরা আমার এখানে এসে পড়েছ তোমাদের সাধ অপূর্ণ রাখবো না নিশ্চয়ই। উনি বোধ হয় আমাদের মনের কথাটা টের পেয়েই বললেন। —কিন্তু তার আগে খাওয়াটা সেরে নাও। অতিথি অভুক্ত থাকুক এ আমি চাই না। আবার সেই বিচিত্র হাসিটা হাসলেন বৃদ্ধ। এটা বোধ হয় ওঁর একটা মুদ্রা দোষ।

তবে পেটে যে আমাদের ক্ষিদের আগুন জ্বলছিল তা অস্বীকার করার নয়। আমার থেকেও বেশি মেঘনাদের। তাই দ্বিতীয়বার এ সম্পর্কে ভাবনার অবকাশ না রেখেই কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা খাবার প্লেট সাফ করে ফেললাম।

আমাদের খাওয়া শেষ হলে সেই আদিবাসী লোকটা এঁটোকাঁটা তুলে নিয়ে চলে গেল। তবে আর একজন কিন্তু একই ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের দিকে সতর্ক চোখে রিভলবার তাক করে।

বৃদ্ধ বললেন, ও লোকটাকে দেখে অস্বস্তি বোধ কোর না তোমরা। আমি না হুকুম করলে ও কিছুই করবে না তোমাদের। তবু ওকে রাখতে হয়েছে নিরাপত্তার জন্যে। বুঝতেই পারছ আমার এই জীর্ণ

প্রাচীন শরীরটাকে কাবু করে ফেলা একটা ব্যাঙের পক্ষেও সম্ভব।

নিজের রসিকতাতেই নিজে হাসলেন বৃদ্ধ। আমরা নিঃশব্দে তাকিয়েছিলাম এই অদ্ভুত মানুষটার দিকে।

—মেঘনাদ, একটা কথা জানিয়ে দিই। তোমার পেট আর উরুর ক্ষতগুলো মারাত্মক কিছু নয়। আগে থেকেই তুমি অবশ্য বুদ্ধি করে পোশাকের নীচে মোটা তুলোর প্যাড পরেছিলে, তবু ডায়নার যে কটা দাঁত তোমায় ছুঁয়ে গেছে তাতেই কিঞ্চিৎ রক্তপাত হয়েছে। কিন্তু আমি ওষুধ দিয়ে বেঁধে দিয়েছি। আমার ওষুধ কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কাজ করে।

—কিন্তু আপনার পরিচয়টা কি জানতে পারি? কে আপনি? মেঘনাদ এতক্ষণে দেয়ালে ঠেস দিয়ে উঠে বসেছে। চোয়াল দুটো ওর শক্ত হয়ে রয়েছে।

—কে আমি? আমার পরিচয় জানতে চাও? বৃদ্ধ এবার হেসে উঠলেন। কৌতুক ঝলমলে এক বিচিত্র হাসি।

—হ্যাঁ, সেটাই আমাদের সব থেকে আগে জানা প্রয়োজন। মেঘনাদের চোখ দুটো জ্বলছে। এতক্ষণে এটা জানতে পেরেছি আপনি একজন বাঙালী। এই পাহাড়ী গুহা, লোকজন, প্রাগৈতিহাসিক বিস্ময় ডাইনোসর, শিনকি উপত্যকার আদিবাসীদের ওঝা দেবীরানী এরা সবাই আপনার নির্দেশে চালিত। সভ্য সমাজ থেকে অনেক দূরে ড্রাগন পাহাড়ে এক বিভীষিকার অন্তরালে আপনি লুকিয়ে আছেন নিশ্চয়ই কোন অসামাজিক উদ্দেশ্য নিয়ে।

—না, এত ভুল। এতক্ষণের প্রসন্ন মেজাজ হারিয়ে বৃদ্ধ হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন। উত্তেজনায় তাঁর সারা শরীরটা কাঁপতে শুরু করেছে। সভ্য সমাজ বলতে তোমরা যা নির্দেশ করো সেটাই আসলে একটা বর্বর, ব্যভিচারী স্থান…

বৃদ্ধ অস্থির পদক্ষেপে বেশ কয়েকবার পায়চারী করলেন গুহার মধ্যে তারপর এক সময় থমকে দাঁড়িয়ে মেঘনাদের দিকে তাকিয়ে

বললেন, আমার পরিচয় জানতে চাও, কিন্তু পরিচয় দিলেও তোমরা, আজকের ছেলেরা কি চিনতে পারবে আমায়? আমি তো আজ হারিয়ে গেছি তোমাদের জগৎ থেকে—তোমাদের তথাকথিত সভ্য সমাজ থেকে। তবু পরিচয় জানাতে আমার বাধা নেই। তুমি যথার্থই অনুমান করেছ আমি বাঙালী। আমার আদি নিবাস কলকাতা। আমার নাম ডক্টর অরবিন্দ রায়চৌধুরী।

আঠারো

[ডক্টর অরবিন্দ রায়চৌধুরী]

স্মৃতির পৃষ্ঠাগুলো দ্রুত উল্টে যাই। কবে, কোথায় যেন শুনেছি এ নাম। কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ে না।

মেঘনাদের কণ্ঠে চমক ভাঙলো। ও বলছে—ডক্টর অরবিন্দ রায়-চৌধুরী মানে কি সেই বিতর্কিত বিজ্ঞানী? একটা পুরনো জার্নালে দেখেছি আজ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে প্রচণ্ড হৈ চৈ বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল যাঁর গবেষণা?

মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল বৃদ্ধের চোখ দুটি। আরও একটু কাছে এগিয়ে এসে আমাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন—ঠিকই বলেছ, আমিই সেই বিজ্ঞানী ডক্টর অরবিন্দ রায়চৌধুরী।

কিছুক্ষণ আমরা কেউ কোন কথা বললাম না। তারপর আবার মেঘনাদই বলল, কিন্তু সভ্য জগতের বাইরে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এখানে কি উদ্দেশ্য সাধন করে চলেছেন আপনি? আদিবাসী ওঝা দেবীরানীর সঙ্গেই বা আপনার সম্পর্ক কি? যতদূর জেনেছি তিনি একজন শিক্ষিতা বাঙালী ঘরের মহিলা—তবে কেন তিনি জংলী আদি-বাসীদের তন্ত্র মন্ত্র কুসংস্কারের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন বছরের পর বছর? আর আদিবাসীদের জীবন্ত দেবতা ওই প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর ডাইনোসরটা, আজও ওটা পৃথিবীতে চরে বেড়াচ্ছে কিভাবে? শুধু তাই নয়, সে একটা পোষা কুকুরের মতো আপনাদের বশ মেনেছে আর প্রতি বছর বৈশাখী পূর্ণিমা রাতে আদিবাসীদের গ্রাম থেকে একটি করে আদিবাসী যুবককে মুখে করে নিয়ে আসছে ড্রাগন পাহাড়ে

আপনার আস্তানায়—এরই বা মূল রহস্য কোথায় ?

এক সঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন নামতার মতো আওড়ে গেছে মেঘনাদ। প্রশ্নগুলো আমার বুকেও পাথরের মতো ভারী হয়ে বসেছিল। এতক্ষণে শুধু এটুকু আমরা জেনেছি ড্রাগন পাহাড়ের সকল রহস্যের মূল চাবিকাঠি এই বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর হাতেই। কিন্তু এ কোন খেলায় মেতে আছেন তিনি ?

মেঘনাদের উজাড় করা প্রশ্নের ঢেউ কিছুক্ষণের জন্য যেন আচ্ছন্ন করে দিল ডক্টর রায়চৌধুরীকে। একটু সময় ঝিম হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরে এমন প্রশ্নের সম্মুখীন তিনি বোধ করি কখনও হন নি।

একটু বাদে মাথা তুললেন তারপর মেঘনাদের তাকিয়ে দিকে বললেন, তোমার সব প্রশ্নের উত্তর আমি দেব তবে আজ নয়। আজকে রাতটা বিশ্রাম কর তোমরা। আগামীকাল তোমাদের সমস্ত কৌতূহল মিটিয়ে দেব কথা দিলাম।

আর দ্বিতীয় কোন বাক্যব্যয় না করে ডক্টর রায়চৌধুরী গুহাঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে সেই রিভলবারধারী পাহারাদারটা।

গুম্ গুম্ শব্দে বন্ধ হয়ে গেল গুহার দরজা।

গুহার মধ্যে আমরা দুজন মুখোমুখি—মেঘনাদ আর আমি।

মেঘনাদকে বললাম, কিছু বুঝতে পারলি ?

—কিছুটা। বাকিটুকুর জন্যে আমাদের আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

বললাম, তোর আয়ুর জোর আছে। যে অবস্থায় এসেছিলি এত চটপট আঘাত সামলে উঠে বসা সম্ভব ছিল না।

—রাখে হরি মারে কে ? মেঘনাদ হাসল : তাছাড়া চিন্তা করে দেখলাম এত দূর এত কষ্ট করে আসার পর রহস্যের সম্পূর্ণ মীমাংস না করে বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না। মৃত্যু তো প্রতি মানুষের জীবনেই অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু মৃত্যুর বিনিময়ে কতটুকু অর্জন করতে পারি আমরা ?

আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবছিলাম মনটা কি ওর সত্যিই শিনকি উপ-ত্যকার শক্ত পাথরের মত তৈরি।

প্রসঙ্গ পালটে বললাম, ডাইনোসরের মুখ থেকে ছাড়া পাবার পর কি দেখলি বল ?

—তখন আমি অজ্ঞান, অচৈতন্য। কিছুই টের পাই নি। জ্ঞান যখন ফিরল দেখি এই গুহায় বন্দী। শরীরে বেশ কয়েকটা ক্ষত, ব্যাণ্ডেজ জড়ান, মাঝে মাঝে যন্ত্রণাও হচ্ছে। কিন্তু তোর কি অভিজ্ঞতা হল শুনি ?

মেঘনাদকে সব কিছুই খুলে বললাম। ড্রাগন পাহাড়ের মুখে ক্যাপ্টেন সিংকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে প্রতীক্ষা করার সময় থেকে ডাইনোসরকে অনুসরণ করে ড্রাগন পাহাড়ের গুহামুখ পর্যন্ত হেঁটে আসার সব কিছু অভিজ্ঞতার কথা। ক্যাপ্টেন সিং যে তাঁর লোকজন নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসবেন এবং পাহাড়ী শিলাখণ্ডের আড়ালে লুকিয়ে থেকে আগামীকাল সন্ধ্যের মধ্যে আমরা এই গুহা থেকে না বেরুলে এক সঙ্গে সবাই মিলে গুহা আক্রমণ করবেন তা জানাতেও ভুললাম না।

মেঘনাদ আগাগোড়া আমার সব কথা চুপ করে মন দিয়ে শুনল তারপর বললো—শুধু শেষের ব্যাপারটাতেই আমার কিছু চিন্তা রইলো। ক্যাপ্টেন সিং যে ধরনের রগচটা মানুষ···বলতে বলতে থেমে গিয়ে বললো. এখন ডক্টর অরবিন্দ রায়চৌধুরীর কর্ম রহস্যটাই সর্বাগ্রে সমাধান হওয়া দরকার।

—কিন্তু এখন কি করার আছে আমাদের ?

—কিছু না। আপাতত নিরালম্ব, নিশ্চিন্ত একটা টানা ঘুম। শরীরটা আমার সত্যিই ভীষণ অবসন্ন।

আস্তে আস্তে শরীরটা চিতিয়ে মেঘনাদ শুয়ে পড়লো। মুহূর্ত পরে নাসিকা গর্জনও শুরু হয়ে গেল। সে গর্জন ড্রাগন পাহাড়ের ডাইনোসরের ডাকের থেকেও কোন অংশে কম ভয়ঙ্কর নয়।

অগত্যা মেঝেতে আমিও লম্বা হলাম।

উনিশ

[গুহার মধ্যে ল্যাবরেটারী]

পরদিন ঘুম ভাঙলো বেশ বেলায়। গুহার ওপর দিকে যে ফোকরটা আছে সেখান দিয়ে সূর্যের আলো এসে ঘরে লুটিয়ে পড়েছে।

ঘুম ভেঙে উঠে দেখি মেঘনাদও ইতিমধ্যে উঠে বসেছে। কি যেন ভাবছে আপন মনে।

আমায় উঠে বসতে দেখে মেঘনাদ বললো, ঘুম ভাঙলো শেষ পর্যন্ত! আয়, আগে ব্রেকফাস্টের সদ্গতি করে নি।

পাথরের ঢিবিটার ওপর দুজনের জন্যে ব্রেকফাস্ট সাজানো রয়েছে। টোস্ট, ডিমসেদ্ধ, চা সেই সঙ্গে এক গুচ্ছ আঙ্গুর। কখন এসে ওরা এখানে রেখে গেছে কে জানে। কিন্তু পটে চা বেশ গরম রয়েছে।

বিনা বাক্যব্যয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে নিলাম।

গুম্ গুম্ শব্দে গুহার দরজাটা আবার খুলে গেল।

প্রবেশ করলো গতকালের সেই গুণ্ডা আকৃতির আদিবাসী লোকটা। দরজার কাছেও একজন দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম। যথারীতি তার হাতে উদ্যত রিভলবার।

প্রথম লোকটির হাতে দুটি তোয়ালে। দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বললো সে। মনে হল সে আমাদের বাইরে যেতে বলছে।

সেই লোকটিই আমাদের প্রাতঃকৃত্যের সব ব্যবস্থা করে দিল। বুঝলাম সব কিছুই ডক্টর রায়চৌধুরীর নির্দেশেই হয়ে চলেছে এবং তাঁর

আতিথ্যের কোন ত্রুটি নেই।

কিন্তু সারা সকালের মধ্যেও আমরা একবার ডক্টর রায়চৌধুরীর সাক্ষাৎ পেলাম না। অবশ্য এজন্য সময় মতো কোন কিছু পেতে আমাদের অসুবিধে হয় নি। এমন কি দুপুরের ভোজনপর্বটিও বেশ সুষ্ঠু ভাবেই সমাধা হয়েছে আমাদের—একেবারে বাঙালী মতে রান্না। আমার তো মনে হচ্ছিল বেশ তোফা আছি।

খাওয়াদাওয়ার পর দুপুরে একটু তন্দ্রামত এসেছিল হঠাৎ সেই পরিচিত গুম্ গুম্ শব্দে উঠে বসলাম।

গুহার দরজা খুলে সেদিনের সেই প্রথম লোকটি প্রবেশ করেছে।

আমাদের কি যেন ইঙ্গিত করলো ও। ঠিক বুঝতে পারলাম না আমি। কিন্তু মেঘনাদ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, অর্ণব, চল আমাদের যেতে হবে—ডক্টর রায়চৌধুরী আমাদের তলব পাঠিয়েছেন।

মেঘনাদ এখন প্রায় সুস্থ, বেশ ভাল ভাবেই হাঁটা চলা করতে পারছে। ডক্টর রায়চৌধুরীর ওষুধ ম্যাজিকের মতই কাজ করেছে।

লোকটির পিছু পিছু আমরা দুজনে হেঁটে চললাম। পেছনে আর একজন রিভলবারধারী ছায়ার মত অনুসরণ করে চলেছে।

হাঁটতে হাঁটতেই বুঝতে পারছিলাম গুহাটা বিশাল। মূল গুহা পথ থেকে অনেক শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন অংশে। মাঝে মাঝে আশে পাশে কয়েকটি গুহা ঘর। মনে হল এক প্রাচীন প্রাকৃতিক গুহাকে বেশ নিপুণভাবেই প্রয়োজনীয় রূপ দেওয়া হয়েছে। মাঝে মাঝে কিছু কিছু খোদাই-এর কাজও রয়েছে।

গুহার একেবারে ভেতরে সূর্যের আলো ঢোকে না কিন্তু ফ্লুরোসেণ্ট বালবের তীব্র আলো সমস্ত অন্ধকার দূর করে দিয়েছে। পাওয়ার স্টেশনের এক নাগাড়ে ঘড়-ঘড় শব্দ। কাছেই কোথাও জেনারেটরে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে।

হঠাৎ একটা গোঙানীর আওয়াজ, কে যেন তীব্র যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে। আমরা থমকে দাঁড়ালাম। শব্দটা খুব কাছেই কোন জায়গা

থেকে ভেসে আসছে। ও কার আর্তনাদ? কিসের যন্ত্রণা ওর? কান পেতে আরও কিছু শোনার চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না।

হঠাৎ পিঠে ধাতব নলের স্পর্শ। রিভলবারধারী প্রহরী আমাদের এগিয়ে চলার নির্দেশ দিচ্ছে।

সে নির্দেশ আপাতত অমান্য করার উপায় নেই।

টানা গুহাপথ ধরে আমরা আবার এগিয়ে চললাম।

আরও কিছুটা হাঁটার পর বাঁদিকে ঘুরলাম। সামনেই একটা বড় গুহাঘর।

একটা বিরাট ল্যাবরেটারী।

নানা রকম আধুনিক বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জামে সাজানো। দেওয়ালের তাকগুলিতে নানা রঙের কেমিক্যালস-এর বোতল। লম্বা টেবিলের ওপর কাঠের হোল্ডিংস-এ বসানো বিভিন্ন আকারের টেস্টটিউব, বুনসেন, বার্ণার। ল্যাবরেটারীর অপরদিকে আরও নানা অদ্ভুত ধরনের যন্ত্র-পাতি—যা আমার মত আনাড়ি লোকের পক্ষে বুঝে ওঠা শক্ত।

সব মিলিয়ে শিনকি উপত্যকার গহন পাহাড়ী অঞ্চলের গুহার মধ্যে এ কি অদ্ভুত বিস্ময়।

দেখলাম আমার মত মেঘনাদের বিস্মিত দৃষ্টিও সারা ল্যাবরেটারী গুহার মধ্যে ঘুরে ফিরছে।

—স্বাগতম মেঘনাদ আর অর্ণব। আশা করি আজকের দিনটা তোমাদের বেশ তোফা আরামেই কেটেছে।

তাকিয়ে দেখি বিজ্ঞানী ডক্টর অরবিন্দ রায়চৌধুরী ল্যাবরেটারী ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে সেই বিচিত্র হাসিটা হাসছেন।

এ হাসি মানুষটার চরিত্রের সঙ্গে কেমন যেন বেমানান বেখাপ্পা মনে হয়।

মাথার ভেতরটা ঝিম ঝিম করে।

—আমি তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছিলাম। কারণটা আশা করি বুঝতে পারছ। গতকাল রাতে আমি কথা দিয়েছিলাম তোমাদের সব কৌতূহল আমি মেটাব।

এরপর ডক্টর রায়চৌধুরী আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা রিভলবারধারী প্রহরীটিকে দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বললেন। সে চলে গেল।

ওকে এখান থেকে বেরিয়ে বাইরে দাঁড়াতে বলেছি। তোমাদের অস্বস্তির কথা অনুমান করেই। সেই বিচিত্র হাসিটা হেসে ডক্টর অরবিন্দ রায়চৌধুরী বললেন—তোমাদের অবস্থায় পড়লে আমারও একই দশা হত স্বীকার করছি।

সামনেই একটা লম্বা সোফা ছিল। সেদিকে আঙুল দেখিয়ে

বললেন—বোস।

বসলাম, সঙ্গে তিনিও বসলেন।

কিছুক্ষণ আমরা কেউ কোন কথা বললাম না। তারপর ডক্টর রায়-চৌধুরী বললেন : আমি আজ আমার জীবনের সমস্ত কথা তোমাদের বলতে পারি, কিন্তু তার সঙ্গে একটা সর্ত থাকবে।

—কি সর্ত ? আমি বললাম।

—আমায় কথা দিতে হবে সব বলার শেষে যা অনুরোধ করবো তাতে রাজী হবে তোমরা।

—অনুরোধ কি না জেনে কথা দেওয়া কি সম্ভব ডক্টর রায়-চৌধুরী ?

মেঘনাদের কথার উত্তরে শান্ত চোখ দুটো একবার জ্বলে উঠলো বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর তারপর মুহূর্ত পরেই ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললেন—বেশ তো, আমার জীবন কাহিনীটাই তাহলে আগে শোন তোমরা।

কুড়ি

[ডাক্তারের আশ্চর্য গবেষণা]

সোফা ছেড়ে উঠে ল্যাবরেটারী গুহা-ঘরে বেশ কয়েকবার পায়চারী করলেন ডক্টর রায়চৌধুরী। অতীতের প্রসঙ্গে স্মৃতির ঝড় উঠেছে তাঁর মনে।

এইভাবে কিছুটা সময় কেটে গেল। আমরাও নীরবে প্রতীক্ষা করছিলাম।

হঠাৎ পায়চারী থামিয়ে থমকে দাঁড়ালেন ডক্টর রায়চৌধুরী। তাঁর দু চোখে এক অদ্ভুত দৃষ্টি। আমাদের দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে বললেন—শোন মেঘনাদ আর অর্ণব। আমি ডক্টর অরবিন্দ রায়-চৌধুরী। সভ্য দুনিয়ার আমি একজন সত্যসন্ধানী বিজ্ঞানী কিন্তু তোমাদের সভ্য সমাজ আমায় শুধু অবহেলাই করে নি, করেছে চরম অপমান আর বঞ্চনা। তা যদি না করতো তাহলে আমার জীবন-ব্যাপী গবেষণার স্বার্থে উত্তরের এই দুর্গম পাহাড়ী গুহায় এমন চোরের মতো লুকিয়ে থেকে গবেষণা চালাতে হত না।

—কি ধরনের অপমান আপনাকে সইতে হয়েছে শুনতে পারি? আর কারণটাই বা কি?

আমার এ প্রশ্নে যেন দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠলো। ডঃ রায়-চৌধুরীর মুখের চেহারা গেল বদলে। বুকের মধ্যে চাপা বারুদে অগ্নি সংযোগ হল বুঝি।

উনি চিৎকার করে উঠলেন—যে অপমান আর অকৃতজ্ঞতার বোঝা একদিন ওরা এক মানবসেবী বিজ্ঞানীর মাথায় চাপাতে চেয়েছে তার

নজির ইতিহাসে দুর্লভ। ওরা আমায় হেনস্থা করেছে, আমার নামে খুনের অভিযোগ এনে আমার বডি ওয়ারেন্ট বার করেছে…।

—ডঃ রায়চৌধুরী।

ডঃ অরবিন্দ রায়চৌধুরী থমকে গেলেন। উত্তেজনার আধিক্যে উনি যেন কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন, এবার প্রকৃতিস্থ হতে চাইলেন। একটু থেমে বললেন—আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে আমি বাস করতাম কলকাতা মহানগরীতে। আমার রিসার্চ ল্যাবরেটারী ছিল ভবানীপুরের রূপচাঁদ মুখার্জী লেনে। পেশায় ছিলাম আমি ডাক্তার।

—আপনার গবেষণার বিষয়বস্তু কি ছিল? মেঘনাদ প্রশ্ন করলো।

—হিউম্যান বডি। মানুষের জরা এবং বার্ধক্য রোধ করে মানুষকে ইচ্ছা মত দীর্ঘায়ু করার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় আমি আমার গবেষণা শুরু করেছিলাম।

—কিন্তু তা কি সম্ভব! আজ পর্যন্ত এ প্রচেষ্টায় কেউ সফলকাম হন নি। তাছাড়া…

মেঘনাদের কথা শেষ হবার আগেই ডঃ রায়চৌধুরী বলে উঠলেন: তাছাড়া তুমি কি বলতে চাও আমি বুঝেছি মেঘনাদ। অতি দীর্ঘ আয়ু সাধারণ মানুষের জীবনকে শুধু বিড়ম্বিতই করে না, আনে অবসাদ, ক্লান্তি। সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে এ জিনিস মারাত্মক সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই সঙ্গে বার্ধক্যও মনুষ্য দেহের স্বাভাবিক পরিণতি …বলতে বলতে ডঃ অরবিন্দ রায়চৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন। ল্যাবরেটারী গুহার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে ফিরে এসে বললেন—কিন্তু মনুষ্য সভ্যতা এবং সামাজিক কল্যাণের প্রয়োজনে কোন কোন বিশেষ মানুষকে এই পৃথিবীর বাতাসে আরও কিছু বেশি বছর সতেজ যৌবনদেহী করে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে এই পৃথিবীই অর্জন করতে পারে আরও কিছু সুফল। বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন ডঃ

রায়চৌধুরী। ভাবতে পার ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় রেনেসাঁর প্রধান প্রাণপুরুষ রাজা রামমোহন, স্বামী বিবেকানন্দ, আচার্য জগদীশ বসু কিংবা রবীন্দ্রনাথকে যদি আরও পঞ্চাশ বছর বাঁচিয়ে রাখা যেত কিংবা এই পৃথিবীতে আমরা যদি আইজাক নিউটন, আইনস্টাইন-এর মত বিজ্ঞানী, মার্কস, লেনিন, হো-চি-মিনের মতো তাত্ত্বিক রাষ্ট্র-নেতাকে আরও বেশ কিছু বছর বাঁচিয়ে রাখতে পারতাম—তবে কি পৃথিবী তাদের কাছ থেকে আরও কিছু অর্জন করতে পারতো না? হয়তো বিশ্বসভ্যতার ইতিহাস যেত বদলে। মনুষ্য জাতির দুর্ভাগ্য শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হয় কিন্তু এ ধরনের প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন মাত্র অল্প কয়েকজন। আরও দুর্ভাগ্য তাঁদের মধ্যেও অনেককেই জীবন থেকে বিদায় নিতে হয় তাঁদের আরাধ্য কর্ম সম্পাদনের পূর্বেই। এই ভাবেই ধরিত্রী যুগে যুগে বঞ্চিত হয় তার সম্পূর্ণ পাওনা থেকে।

আমরা নিঃশব্দে শুনছিলাম ডঃ রায়চৌধুরীর কথাগুলি। তাঁর কণ্ঠস্বরে আশ্চর্য প্রত্যয়। একটু থেমে আবার উনি বলতে শুরু করলেনঃ তাই মানুষের দীর্ঘায়ু লাভের ব্যাপারটা নিয়েই আমি আমার গবেষণা শুরু করি। আমি আমার গবেষণার খুঁটিনাটি তথ্য-গুলো তোমাদের কাছে প্রকাশ করতে রাজী নই তবে এ ব্যাপারে প্রধান যে বিষয়টা আমি বেছে নিয়েছি তা হল মানুষকে দীর্ঘায়ু করার জন্য সর্বাগ্রে দরকার মানুষের শরীরের ক্ষয় অথবা বার্ধক্যকে জয় করা। একজন যৌবন চঞ্চল সতেজ সবল মানুষ অনেক বেশি আয়ুর অধিকারী হতে পারে।

—কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় মানুষের বার্ধক্য জয় করা কি সম্ভব। মেঘনাদ আবার তার সংশয় প্রকাশ করে।

—অবশ্যই সম্ভব। উত্তেজনার আধিক্যে চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ডঃ রায়চৌধুরীর। তিনি বলে চলেনঃ মানুষের বার্ধক্যের মূল কারণটা জানলেই আমরা কিন্তু আমাদের লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হতে পারি। বিভিন্ন বিজ্ঞানী এ বিষয়ে নানা তত্ত্বের অবতারণা করলেও

আমি মূলতঃ গবেষণার মাধ্যমে যা জেনেছি তা হল লক্ষ লক্ষ জিন দিয়ে তৈরি এক একটি ক্রোমোসোম—যে ক্রোমোসোম দিয়ে দেহকোষ গঠিত, আসলে এই জিনগুলিই হল সমস্ত শারীরবৃত্তীয় ঘটনার নিয়ন্ত্রক। জন্মের পর থেকেই এরা পর্যায় ক্রমে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে দিয়ে জীবনকে চালিত করে সমাপ্তির দিকে ঠেলে দেয়। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের অবস্থা দাঁড়ায় ছাপাখানার পুরনো ব্লকের মতো। ক্রমান্বয়ে একই ব্লকে ছাপতে ছাপতে ব্লকটি যেমন ক্ষয়ে আসে ঠিক তেমনই ক্রমান্বয়ে শারীরবৃত্তীয় কাজ করতে করতে জীব-কোষের 'জিন'-এর অবস্থাও দাঁড়ায় ছাপাখানার ছবির ব্লকটির মতো। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহকোষের 'জিনের' বৈক্লব্য ঘটে। তখন তৈরি করতে থাকে এক ধরনের 'এনজাইম' বা 'বিপাকীয়-যৌগ'—যাদের তৈরি নানা ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রোটিন শারীরবৃত্তীয় ঘটনাকে ব্যাহত করে। তখনই শুরু হয় শরীরের ক্ষয়—ত্বরান্বিত হয় বার্ধক্য বা জরা। এই পর্যন্ত বলে বোধ হয় একটু দম নিলেন ড° রায়চৌধুরী তারপর ধীর গম্ভীর স্বরে শেষটুকু যোগ করলেন—আমার গবেষণা মানুষের দেহ-কোষের ক্রোমোসোম-এর প্রাণ 'জিন'-এর রহস্য ভেদ করে তাকে আরও দীর্ঘস্থায়ী সতেজ করে মানুষের আয়ুকেও কার্যকরীভাবে বৃদ্ধি করা। এতে শুধু যে মানুষ আয়ু এবং যৌবনই ফিরে পেতে পারে তাই নয়—আমার গবেষণার সাফল্যে রোধ হতে পারে মানুষের শরীরের অধিকাংশ রোগ এবং ব্যাধি। এই স্বপ্ন নিয়েই আমি আমার গবেষণা শুরু করেছিলাম আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে।

—তারপর? যেন অজান্তেই শব্দটা আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

—গবেষণা শুরু করেছিলাম প্রথমে উদ্ভিদের ওপর। কয়েক বছর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে সুফল পেলাম। এরপর পরীক্ষা চালালাম টিকটিকি, গিনিপিগ, খরগোস ইত্যাদি ছোটখাট জীবের ওপর। তারপর একদিন মনে হল এবার কোন মানুষের শরীরে আমার এ এক্সপেরি-

মেণ্টটা চালান দরকার।

এই পর্যন্ত বলে একটু থামলেন ডঃ রায়চৌধুরী, তারপর আবার বলতে শুরু করলেন :

—ছোটখাট জীবের ক্ষেত্রে যেটা সম্ভব হয়েছে মানুষের ক্ষেত্রে তা অত সহজ নয়। মানুষের শরীর আরও সূক্ষ্ম এবং জটিল কলকজায় ভরা।···

তবু দুঃসাহসে বুক বেঁধে মানুষের ওপর পরীক্ষা শুরু করার পরিকল্পনা নিলাম।

কিন্তু এ পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন যে সুস্থ সবল মানুষ—তা কোথায় পাব?

উদ্দেশ্য যত মহৎই হোক, নিজের জীবনকে অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়ে কজন এগিয়ে আসে এই সব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় নিজেকে উৎসর্গ করতে?

কিন্তু তবু এগিয়ে এল একজন—আমারই রিসার্চ এ্যাসিসটেণ্ট শুভাশিস রায়। আমার কোন আপত্তিতেই সে কান দিল না। স্ত্রী তার আগেই মারা গেছে, সংসারে আছে তার একটি মাত্র মেয়ে, বছর পাঁচেক তার বয়স আর আছে কিছু সম্পত্তি। আমায় দেবতার মত ভক্তি করতো শুভাশিস। তার দৃঢ় ধারণা ছিল আমার এক্সপেরিমেণ্ট ব্যর্থ হতে পারে না। তবু তার ওপর এক্সপেরিমেণ্ট শুরু করার আগে জোর করে তার সমস্ত সম্পত্তি আমার নামে লিখে দিল—সেই সঙ্গে তার মেয়ে মিতালীর দায়-দায়িত্ব।

—পরীক্ষা কি আপনার সফল হয়েছিল? আমি প্রশ্ন করি।

—না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডঃ রায়চৌধুরী, তারপর বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন—ল্যাবরেটারীতে শুভাশিসের 'জিন'-এ কেমিক্যাল ট্রিটমেণ্ট প্রয়োগ করার ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই মৃত্যু হয়েছিল ওর। যে ছিল পৃথিবীতে আমার সব থেকে আপনজন—দীর্ঘ দশ বছর গবেষণায় যে ছিল আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী—যে তার যথাসর্বস্ব এবং নিজের জীবন-

টাকেও দান করে গেল আমার গবেষণার কাজে···বলতে বলতে অশ্রুরুদ্ধ হয়ে এল ডঃ রায়চৌধুরীর কণ্ঠস্বর। কিছুক্ষণ চুপ করে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থেকে সম্ভবতঃ নিজেকে সামলাবার চেষ্টাই করতে লাগলেন।

—তারপর? আমি নীরবতা ভাঙলাম।

—এক্সপেরিমেণ্ট কিন্তু আমি বন্ধ করলাম না। সেই মুহূর্তে এক্সপেরিমেণ্ট বন্ধ করার অর্থ শুভাশিসের আত্মবলিদান ব্যর্থ হয়ে যাওয়া। তাছাড়া কেনই বা বন্ধ করবো আমার গবেষণা—আমি জানতাম আমার থিয়োরী নির্ভুল। গলদ যেটুকু তা প্রয়োগ পদ্ধতিতে। সফল একদিন আমি হবোই।

সুতরাং এ পরীক্ষা আমায় চালিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু কার ওপর প্রয়োগ করবো আমার কেমিক্যাল ট্রিটমেণ্ট? মানুষ কোথায়? শুভাশিসের মত আর কে এগিয়ে আসবে নিজের জীবনের বিনিময়ে বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির স্বার্থে?

কেউ রাজী হল না।

আশাভঙ্গের অস্থিরতায় আমি ক্রমশ উন্মাদ হয়ে উঠতে লাগলাম। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য সুস্থ জীবন্ত মানুষ আমার চাই-ই। যে কোন পথে, যে কোন উপায়ে।

অবশেষে অন্ধকার বাঁকা পথে নামলাম।

তখন সবে মাত্র দেশ বিভাগ হয়েছে। হাজার হাজার ছিন্নমূল উদ্বাস্তু সীমান্ত পেরিয়ে এপার বাঙলায় পালিয়ে আসছে। সুষ্ঠু পুনর্বাসন অনেকেই পাচ্ছে না, তারা রাত কাটাতে বাধ্য হচ্ছে শিয়ালদহ ষ্টেশন, ফুটপাথ কিংবা বাড়ির খোলা গাড়ি বারান্দায়।

আমি রাতের অন্ধকারে মানুষ চুরি শুরু করলাম।

—মানুষ চুরি? মেঘনাদের কণ্ঠে বিস্ময়।

—হ্যাঁ। উত্তেজনায় গলা কাঁপতে লাগলো ডঃ রায়চৌধুরীর। বললেন: কি দাম ওই মানুষগুলোর। জীবনের অবহেলায় আর

বুভুক্ষায় ওদের তো অনেকেরই মৃত্যু হত কিছুদিনের মধ্যে। তার মধ্যে কয়েকজন যদি জীবন উৎসর্গ করে—আগামী কালের বিজ্ঞান শুরু করবে নতুন ইতিহাস। সভ্যতা এগিয়ে যাবে নতুন আলোর পথে।

—কিন্তু এ কাজ করতেন কি ভাবে? জিজ্ঞেস না করে পারি না।

—নির্জন রাতে একা একা গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম শহর কলকাতার আনাচে কানাচে। তারপর সুবিধে মতো জায়গায় সুযোগ পেলেই ক্লোরোফরমে অজ্ঞান করে তুলে আনতাম কোন ভবঘুরেকে।

কিন্তু এত প্রচেষ্টা, অধ্যবসায় সত্ত্বেও আমি সফলতার মুখ দেখতে পেলাম না। একটা মানুষও বাঁচলো না। জিনের ওপর কেমিক্যাল ট্রিটমেণ্টের ধাক্কা একটা শরীরও সইতে পারলো না। মাত্র কয়েক ঘণ্টা, তারপরই আমার পরীক্ষিত মানুষটি ঢলে পড়তো মৃত্যু ঘুমে।

এই ভাবে একটার পর একটা মানুষ মরতে লাগলো আমার হাতে। বুঝলাম, আমার গবেষণা এবং তত্ত্বের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন মারাত্মক ত্রুটি রয়ে গেছে। সেটি আবিষ্কার না করতে পারা পর্যন্ত চালাতে হবে আরও পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা কার্য। এজন্য প্রয়োজন আরও মনুষ্য দেহ।

এক্সপেরিমেণ্ট আমার বন্ধ হল না। কিন্তু বাধা এল অন্য জায়গা থেকে। মারাত্মক বাধা। রাতের আঁধারে কলকাতার ফুটপাত থেকে একটার পর একটা মানুষ নিখোঁজ হয়ে যাবার ঘটনায় পুলিশের টনক নড়েছিল আগেই, এরপর গোয়েন্দা লাগলো আমার পেছনে। প্রায় ধরা পড়ে যাবার অবস্থায় পৌছলাম। আমি বুঝেছিলাম ধরা যদি পড়ি—আইন আমাকে রেহাই দেবে না। উদ্দেশ্য আমার যত মহৎই হোক সভ্য মানুষের বিচারশালা আমায় অভিযুক্ত করবে বহু হত্যাকাণ্ডের অপরাধে। শাস্তি অবধারিত মৃত্যুদণ্ড।

বলতে বলতে শ্বাপদের মত জ্বলে উঠলো ডঃ অরবিন্দ রায়চৌধুরীর চক্ষু দুটি। তীব্র কণ্ঠে বলতে লাগলেন—এই হল মানুষের

সভ্যতার বিচারদণ্ড। অথচ ওপর তলার কিছু মানুষের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-সিদ্ধির প্রয়োজনে ভণ্ডামী আর মিথ্যা আদর্শের যূপকাষ্ঠে প্রতিনিয়ত বলি দেওয়া হয় হাজার হাজার নিরীহ সরল দেশবাসীকে। তার কোন বিচার হয় না। এদের শাস্তি দেবার জন্য কোন বিচারালয়ও বোধ করি এখনও তৈরি হয়নি কিন্তু সেই অনুপাতে কি এমন অপরাধ করে-ছিলাম আমি? বিজ্ঞান গবেষণার স্বার্থে কয়েকটি প্রাণ শুধুমাত্র উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। যাদের জীবনের দাম আগেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল শূন্যে। তিলে তিলে মৃত্যু ছাড়া আর কোন পথই খোলা ছিল না সেই সব হতভাগ্যদের সামনে।

অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন ডঃ রায়চৌধুরী। মেঘনাদ আসল প্রসঙ্গের খেই ধরিয়ে দিতে চাইলো—তারপর কি করলেন আপনি?

—কলকাতা ছেড়ে পালালাম। গোপনে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে শুধু মাত্র ল্যাবরেটারির কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং শুভাশিসের মেয়ে মিতালীকে সঙ্গে নিয়ে সর্বপ্রথম গিয়ে উঠলাম এলাহাবাদে। আমার এক পুরনো সতীর্থ ওখানকার কলেজে অধ্যাপনা করতো। মিতালীকে ওর কাছে রেখে এবার আমি বেরিয়ে পড়লাম সম্পূর্ণ একা।

—নিশ্চয়ই সাধু সন্ন্যাসী হবার কোন পরিকল্পনা সেই মুহূর্তে আপনার মাথায় আসে নি? মেঘনাদের কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ চাপা রইলো না।

সেটুকু গায়ে মাখলেন না ডঃ রায়চৌধুরী। উনি বলে চললেন—সাময়িক এক হতাশা যে মনকে আচ্ছন্ন করেনি তা বলতে পারি না কিন্তু সেটুকু কাটাতে দেরি হল না। দেশের অনেক জায়গায় ঘুরলাম। দেখলাম কত মানুষ আর প্রকৃতি। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন রীতি নীতি। বাইরের পোশাক, ভাষা আর আচরণে যত ভেদই থাকুক মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি কিন্তু সর্বদাই এক। ছয় রিপুর প্রাবল্য

কিংবা স্নেহ প্রীতির নিগড়ে বাঁধা। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পুব থেকে পশ্চিম, পাহাড় কিংবা সমতল সর্বত্রই একই ধারা বয়ে চলেছে। এই ভাবে ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌছলাম হিমাচল প্রদেশে। এর উত্তরেই আছে গিরিরাজ হিমালয়। দেবতাত্মা হিমালয় ছেলেবেলা থেকেই আমায় আকর্ষণ করতো। এর শান্ত গম্ভীর রূপ আমার প্রাণে ছুঁইয়ে দিত এক আশ্চর্য অতীন্দ্রিয় অনুভূতির পরশ। কিন্তু মন চাইলেও কখনও এই ভাবরাজ্যে পদক্ষেপের অবসর মেলেনি। এতদিনে সে সুযোগ মিললো।

হিমালয়ের পাহাড়ী উপত্যকায়, গুহায় কন্দরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম দিনের পর দিন। এক অদ্ভুত নেশায় পেয়ে বসলো আমায়, এখানকার আদিম অধিবাসীদের বিচিত্র জীবন, ধর্ম বিশ্বাস, সংস্কার মনে বিস্ময় সৃষ্টি করতো। নানা উপজাতি ট্রাইব ছড়িয়ে আছে এই পাহাড়ী অঞ্চলে। এদের আচার আচরণে আদিম সরলতা, বিশ্বাস আর চিন্তা জগতে পুরনো ধ্যান ধারণা। বর্তমান সভ্যতার কলুষ থেকেও এরা মুক্ত তাই আজকের অহংকার এবং ভণ্ডামী এদের স্পর্শ করতে পারেনি।

এই সময়ই আমি আবিষ্কার করলাম এক অত্যাশ্চর্য জিনিস।

তুষারধবল হিমালয় পর্বতের অনেকটা উঁচুতে উঠেছিলাম হিমালয়ের আশ্চর্যরূপ উপলব্ধির জন্য। কিছুদিন ভ্রমণের মধ্যে দিয়ে মনের হতাশা আর ক্লান্তি তখন অনেকটাই বিদূরিত। ইচ্ছে ছিল ধ্যানমগ্ন হিমালয়ের তুষার কিরীটী দর্শন করে আবার ফিরে যাবো আমার নিজের জগতে। গবেষণা আমার তখনও অসম্পূর্ণ।

ঠিক সেই সময়ই—এই শিনকি উপত্যকার আরও উত্তরে হাজার হাজার বছরের বরফের রাজ্যে একদিন ভয়ঙ্কর তুষার ঝড়ের মধ্যে পড়লাম। ওই অবস্থায় প্রাণ ফিরে পাব ভাবিনি কিন্তু তবু যখন প্রাণ পেলাম কোথায় যে ছিটকে গিয়ে পড়েছি বুঝতে পারলাম না। দিক্ নির্দেশ করতে না পেরে চলে গিয়েছিলাম আরও উত্তরে। সভ্য মানুষের পদক্ষেপ সেখানে কোনদিন পড়েনি। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু

বরফ আর বরফ। জমাট, কঠিন বরফের স্তূপ। এরই মধ্যে চোখে পড়লো নিরেট বরফের মধ্যে প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্ট এক সাম্প্রতিক ফাটল। ফাটলের মধ্যে কি একটা রয়েছে দেখা যাচ্ছে না? কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গিয়ে লক্ষ্য করলাম। অদ্ভুত আকৃতির একটি ডিম।

আমি আশ্চর্য হয়ে থমকে দাঁড়ালাম। হিমালয়ের এই বরফ রাজ্য সম্পূর্ণভাবে কোন জীব বা উদ্ভিদহীন। তাহলে এই ডিম এল কোথা থেকে? ডিমের গঠণ কিংবা আকারও আমার চেনা জানা অথবা জ্ঞানের আওতার কোন পাখি কিংবা সরীসৃপের বলে মনে হল না। পাঁশুটে রঙের ডিমটা আকারে একটা বড় হাঁসের ডিমের চেয়ে অন্ততঃ পঞ্চাশ গুণ বড়।

ডিম নিয়ে নেমে এলাম শিনকি উপত্যকায়। এই পাহাড়ী গুহায় বিশেষ কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় ডিমটিকে ফুটিয়ে বাচ্চার জন্ম দিলাম।

ডিম থেকে জন্ম নিল বিচিত্র চেহারার টিকটিকি জাতীয় এক অদ্ভুত সরীসৃপ শিশু।

জীবটি ভাল করে পরীক্ষা করেই চমকে উঠলাম আমি।

এ যে অবিশ্বাস্য।

ডিম ফুটে যে সরীসৃপের জন্ম হয়েছে তার বাস ছিল লুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীতে। দশ কোটি বছর আগের ডাইনোসর গোষ্ঠীর এটি ব্রণ্টোসরাস শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

—কিন্তু এটা কি করে সম্ভব হল ডঃ রায়চৌধুরী? আমি প্রশ্ন না তুলে পারলাম না—দশ কোটি বছর পূর্বের কোন সরীসৃপ প্রাণীর ডিম এত কোটি বছর যাবৎ থেকে যেতে পারে?

—ব্যাপারটা বিস্ময়কর সন্দেহ নেই কিন্তু এক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে। আমার ধারণা হিমালয় অঞ্চলের কোটি কোটি বছর যাবৎ প্রচণ্ড শৈত্য এবং বরফের নীচে ডিমটি হিমায়িত হয়ে থাকার ফলেই এই ভাবে ডিমের প্রাণ যুগ যুগ ধরে ডিমের ভেতর অব্যক্ত অবস্থায় থাকতে পেরেছে—ঠিক যেমন ভাবে উদ্ভিদের বীজ ঘুমিয়ে থাকতে পারে

বছরের পর বছর কোন সংরক্ষিত স্থানে। তারপর অনুকূল পরিবেশে মাটি আর জলের স্পর্শ পেয়ে জেগে ওঠে তার প্রাণ, বেরিয়ে আসে অঙ্কুর। এইভাবে জীবিত দেহকে হিমায়িত করে রাখার পদ্ধতি আজকের বিজ্ঞানের মোটেই অজানা নয়। জনৈক মার্কিন বিজ্ঞানী কিছুদিন আগে একটি বাঁদরকে একাদিক্রমে দশ বছর হিমায়িত করে রাখতে পেরেছিলেন বলে শোনা গেছে। আগামী দিনে এর প্রয়োজন বিজ্ঞানীরা আরও বেশি করে অনুভব করবেন—বিশেষতঃ দূর মহাকাশ যাত্রার দিনগুলিতে।

—তারপর ডঃ রায়চৌধুরী? কথার আবেগে প্রসঙ্গের বাইরে চলে যাচ্ছিলেন বৃদ্ধ বিজ্ঞানী। মেঘনাদ তাই আসল কথার খেই ধরিয়ে দিতে চাইলো।

—তারপর? হ্যাঁ, তারপরই শুরু হল আমার জীবনের নতুন অধ্যায়। রূপকথার মতো অবিশ্বাস্য মনে হলেও তা রোমাঞ্চকর কঠিন বাস্তব।

বিজ্ঞানী অরবিন্দ রায়চৌধুরী আবার তাঁর সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালেন তারপর সেই দীর্ঘ ল্যাবরেটারি গুহার অপর প্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে ফিরে এসে দাঁড়ালেন আমাদের মুখোমুখি। কিছুক্ষণ জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে থেকে ফিসফিস করে বললেন—সভ্য পৃথিবীর তথাকথিত সভ্য মানুষদের মধ্যে একমাত্র তোমরাই জানবে সেই রোমাঞ্চকর আশ্চর্য সত্য। যা আজ পর্যন্ত কেউ কল্পনাও করতে পারে নি।

প্রতি মুহূর্তের উত্তেজনায় ডঃ রায়চৌধুরীর চোখ দুটো হয়ে উঠছে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর।

একুশ

[রহস্যের জট খুললো]

এক অস্বস্তিকর নীরবতা আমাদের চেতনায় অস্থির তরঙ্গ ছড়াচ্ছিল।

এ অস্থিরতার আর এক নাম দুরন্ত কৌতূহল।

—এই সময়েই পরিকল্পনাটা আমার মাথায় এসেছিল।

ডঃ রায়চৌধুরীর এই আচমকা শুরু করাটা আমার কাছে মোটেই সহজবোধ্য হল না। বললাম—কিসের পরিকল্পনার কথা বলছেন আপনি?

আমার প্রশ্নের সরাসরি উত্তর এড়িয়ে গিয়ে ডঃ রায়চৌধুরী বলতে লাগলেন: সর্বপ্রথম আমার কাজ হল শিনকি গিরি উপত্যকার উত্তরে দুর্ভেদ্য পাহাড়ী অঞ্চলে এই দুর্গম পাহাড়ের বিশাল গুহাটার মধ্যে আমার গবেষণাগার তৈরি করা। অত্যাধুনিক এবং প্রয়োজনীয় সব রকম সাজ সরঞ্জামে স্বয়ংসম্পূর্ণ হল আমার ল্যাবরেটারী। এই সঙ্গে গুহাপথটিকেও ভেতরে আরও সম্প্রসারিত এবং কাজের উপযোগী করে তুললাম। শিশু ডাইনোসরটা তখন সবেমাত্র হাঁটতে শিখেছে। আমার বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগে ওর বৃদ্ধি হতে শুরু করলো দ্রুততর। বছর খানেকের মধ্যেই ডাইনোসর তার পূর্ণ অবয়ব লাভ করলো তারপর মিতালীকে নিয়ে এলাম এলাহাবাদ থেকে। ওর তখন বয়স মাত্র পনের। ডাইনোসরটাকে মিতালী পোষ মানিয়ে ফেললো। মেয়েটি ভারী বুদ্ধিমতী আর সাহসী। এদের সাহায্যে আমি আবার শুরু করলাম আমার অসম্পূর্ণ গবেষণা। ডঃ রায়চৌধুরী একটু থামলেন।

দুর্বোধ্যতার কুয়াশা তখন একটু একটু করে আমার মন থেকে সরে যেতে শুরু করেছে। বিজ্ঞানী রায়চৌধুরীর পরিকল্পনার রূপরেখা এখন আমার কাছে স্পষ্টতর তবু কাহিনীর সবটাই ডঃ রায়চৌধুরীর মুখ থেকে শুনতে চাই। তাই বললাম—কি ভাবে তা সম্ভব হল?

—শিনকি উপত্যকার পাহাড়ী আদিবাসীরা আমায় দীর্ঘ তিরিশ বছর গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় মানুষ যুগিয়েছে।

অজান্তেই শিউরে উঠলাম। ডঃ রায়চৌধুরী অক্লেশে যেভাবে কথাটা বলতে পারলেন তার অর্থ বিষয়টির ভয়াবহতা উপলব্ধি করার ক্ষমতা উনি হারিয়েছেন।

মানুষ কি কখনও যথেচ্ছভাবে ল্যাবরেটারির গিনিপিগ হতে পারে?

নিজের বাহাদুরীর কথা বলতে বলতে বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর সারা মুখটা তখন উত্তেজনায় চকচক করছে। উনি বলে চললেন—কার্যসিদ্ধির পথ কিন্তু মোটেই সহজ ছিল না। এর জন্য বিশেষ কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে।

তোমরা তো জান হিমালয় পর্বতের পাদদেশে যারা বাস করে সেই পাহাড়ী আদিবাসীদের নানা শাখা আজও পর্যন্ত নানা অদ্ভুত ধ্যান ধারণা, বিশ্বাস আর কুসংস্কার নিয়ে মেতে আছে। ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানব এসবের প্রভাব এদের মধ্যে অনেকেরই ধর্মবিশ্বাস এবং জীবন-যাত্রার মধ্যে বহু যুগ যাবৎ জড়িত।

ওদের এই অদ্ভুত ধর্মবিশ্বাস আর সংস্কারকে আমি আমার পরি-কল্পনার কাজে লাগালাম।

এক দুর্যোগের রাতে প্রকৃতি যখন মাতাল—আমার পোষা ডাই-নোসরটার পিঠে চড়ে মিতালী আবির্ভূত হল শিনকি উপত্যকার ওই আদিবাসী ট্রাইবদের গ্রামে।

প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসরের ওই প্রকাণ্ড আকার, গর্জন আর মিতালীর অভিনয়ে ওরা হতবুদ্ধি হল তারপর ওদের সরল যুক্তি দিয়ে

বিশ্বাস করতে দেরি করলো না যে ড্রাগন দেবতার বাহনের পিঠে চড়ে স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন এক দেবী। তিনি স্বর্গের দেবতাদের প্রতিনিধি। এই দেবী কল্যাণময়ী। ইনি তুষ্ট থাকলে পাহাড়ী আদিবাসীরা মুক্তি পায় কঠিন রোগ ব্যাধি থেকে, নানা দৈনন্দিন সমস্যা থেকে—অবশ্য এ সবই সম্ভব হত মিতালীর মাধ্যমে আমার অদৃশ্য হস্তক্ষেপে। কিন্তু মিতালী ওদের জয় করে ফেললো। মিতালীকে ওরা মেনে নিল ওদের গ্রামের সম্মানিত ওঝা হিসাবে, মিতালী হল ওদের দেবীরানী।

আমার পরিকল্পনার প্রথম পর্যায় সম্পূর্ণ হল। আমার আসল উদ্দেশ্য পূরণ হতে চললো এইবার।

দেবীরানীর মাধ্যমে আমি প্রচার করলাম ওদের গ্রামের উত্তর দিকে যে দুর্গম পাহাড় শুরু হয়েছে—ওটি ড্রাগন দেবতার বাসভূমি। ওখানে জীবন্ত মানুষ গেলে আর ফেরে না। ওই প্রচারের কারণ ওই পাহাড়ের গুহায় আমার ল্যাবরেটারীর অবস্থা যাতে অন্যের কাছে ধরা পড়ে না যায়। তাহলেই আমার সমস্ত পরিকল্পনা পণ্ড হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

এই সঙ্গে আরও একটা প্রথা চালু করলাম আমি, গ্রামের কল্যাণের স্বার্থে প্রতি বছর বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে একটি করে আদিবাসী যুবক কিংবা যুবতীকে ওদের উৎসর্গ করতে হবে ড্রাগন দেবতার উদ্দেশ্যে।

এ প্রথা আজও চালু রয়েছে।

প্রতি বছর ওই নির্দিষ্ট রাতটিতে আদিবাসীদের উৎসর্গ করা একটি প্রাণ আমার পোষা ডাইনোসরটি সুকৌশলে তুলে আনে ওই গ্রামের ড্রাগন দেবতার বেদী থেকে ড্রাগন পাহাড়ের ভেতর আমার এই ল্যাবরেটারী গুহায়।

এই ভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিরাপদে চালিয়ে যাচ্ছি আমার দুরূহ গবেষণার কাজ। এই গবেষণার সার্থকতাই আমার জীবনের

চরম এবং একমাত্র লক্ষ্য।

শুনতে শুনতে মাথাটা আমার ঝিম ঝিম করছিল। কোন সুস্থ মানুষ এমন ভয়ঙ্কর পরিকল্পনায় লিপ্ত হতে পারে আমার কোনকালে ধারণা ছিল না। গবেষণার নামে আজ পর্যন্ত কত যে তাজা প্রাণ বলি দেওয়া হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এই বিজ্ঞানী কি আসলে একজন উন্মাদ?

হঠাৎ চমক ভাঙলো। ডঃ রায়চৌধুরী আমার আর মেঘনাদের অনেক কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছেন। ওঁর দু চোখে এক অদ্ভুত দৃষ্টি। চোখে চোখ পড়তে চাপা ফ্যাসফ্যাসে স্বরে বললেন—তোমাদের অনুরোধ রক্ষা করে আমার সমস্ত গুপ্ত কথা তোমাদের শুনিয়ে দিলাম, এইবার আমার একমাত্র অনুরোধটাও আশা করি রাখবে তোমরা?

এই উন্মাদ বিজ্ঞানী কি অনুরোধ করতে চান আমাদের? কি?

বাইশ

[অনুরোধের অর্থ]

আমি আর মেঘনাদ প্রায় একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম—না, আপনার এ অনুরোধে আমরা কিছুতেই সম্মত হতে পারি না। এ অমানুষিক, এ উন্মত্ততা।

ডঃ রায়চৌধুরীর চোখ দুটো এখন হায়নার চোখের মতো হিংস্রতায় জ্বলজ্বল করছে। খসে পড়েছে এতক্ষণের ভদ্রতা আর সৌজন্যের মুখোসটুকু। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, কিন্তু রাজী যে তোমাদের হতেই হবে আগন্তুক বন্ধুরা। পৃথিবীর একান্ত নিরালা কোণে তৈরি করেছিলাম আমার নিজস্ব গবেষণার জগৎ—এ যাবৎ কেউ মাথা গলাতে পারে নি···কিন্তু আজ আমার ফেলে আসা পৃথিবীর তথাকথিত সভ্য স্বার্থপর মূর্খ মানুষ আবার হানা দিয়েছে আমার এই সাধনক্ষেত্রে —এ আমি কিছুতেই সহ্য করবো না···।

ডঃ রায়চৌধুরীকে আর মোটেই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। হাত দুটো কেবলই মুষ্টিবদ্ধ হচ্ছে। দাঁত দিয়ে চেপে ধরেছেন নীচের ঠোঁটটা।

—কিন্তু আমাদের আপনি বৃথাই সন্দেহ করছেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ড্রাগন পাহাড়ের প্রকৃত রহস্য ভেদ করা। মেঘনাদের কণ্ঠস্বর শুনে মনে হল ও ভেতরে ভেতরে বেশ কিছুটা নার্ভাস হয়ে পড়েছে এবং এ অবস্থায় তা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

—মূর্খ! বিজ্ঞানী রায়চৌধুরী চিৎকার করে উঠলেন—তোমাদের

দুঃসাহসের পরিণাম তোমাদেরই বহন করতে হবে। স্বেচ্ছায় জীবন্ত সিংহের গুহায় কেউ প্রবেশ করলে সিংহ কখনও তাকে ছেড়ে দেয় না। তোমাদের সম্পর্কে প্রতিদিনের খবর আমার জানা। নিজেদের খুবই চালাক এবং হিসেবী ভেবেছিলে তাই না?

মনে মনে আবার শিউরে উঠলাম। সত্যিই কি আমাদের সবটুকু কর্মধারা জেনেছেন উনি? ক্যাপ্টেন সিং তাঁর অনুসরণের কথাটাও কি জেনেছেন? যদি জেনে থাকেন তবে তো এতক্ষণে তাঁকেও কোথাও গ্রেফতার করে রাখা হয়েছে। ভাবতেই চোখের সামনে পৃথিবীটা দুলে উঠলো।

বিজ্ঞানী ডঃ রায়চৌধুরীর ঠোঁটের কোণে এক ক্রুর ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠছে। বললেন, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বিজ্ঞানের এক মহান গবেষণার স্বার্থে তোমরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে চলেছ।

—না। আমি চিৎকার করে উঠলাম—এ কাজ আপনি করতে পারেন না ডঃ রায়চৌধুরী।

—ড্রাগন পাহাড় আমার রাজ্য। এখানে আমাকে বাধা দেবার কেউ নেই। আমি আমার জীবন আর গবেষণার কাহিনী শুরু করার আগে আমার সর্তের কথা বলেছিলাম। এটাই আমার সর্ত। তা ছাড়া সব কিছু জানার পর আমার অনুরোধে রাজী হওয়া ছাড়া উপায়ই বা কি?

কিন্তু আমরা আপনার সর্ত বা অনুরোধে রাজী হয়েছি একথা তো বলিনি, মেঘনাদ বললো।

—তোমাদের মতামতের দাম আমার কাছে আর কিছুই নেই। তোমাদের আমার পক্ষে আর এ গবেষণাগার থেকে যেতে দেওয়াও সম্ভব নয়।

—কারণ?

—কারণ তোমরা স্বেচ্ছায় এই ভয়ঙ্করের গুহায় পা দিয়েছ। এখানে ঢোকার পথ খোলা, কিন্তু বেরুবার পথ বন্ধ। তা ছাড়া আমার

এক্সপেরিমেন্টের জন্যে নতুন মানুষ দরকার। প্রতি বৈশাখী পূর্ণিমা রাতটির অপেক্ষায় আমি বেশ কয়েকটি বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করি, কিন্তু আমার পোষা ডাইনোসর এবার যাকে আদিবাসী গ্রামের ড্রাগন বেদী থেকে তুলে এনেছে সে শিনকি উপত্যকার কোন পাহাড়ী আদি-বাসী তরুণ নয়—কলকাতার শিক্ষিত বাঙালী দুঃসাহসী যুবক মেঘনাদ ভরদ্বাজ। বলতে বলতে ডঃ রায়চৌধুরী হা হা-করে হেসে উঠলেন—ক্ষতি আমার তাতে কিছু হয় নি বরং সঙ্গে আছে আর একটি তাজা তরুণ শরীর। আমার গবেষণার নতুন ফরমুলা আমি আজ রাতেই তোমাদের ওপর প্রয়োগ করবো।

আতঙ্কে হিম হয়ে গেলাম।

বিজ্ঞানী রায়চৌধুরী আগের মতোই কঠিন চোখে তাকিয়ে বললেন—তবে আমার আশা হয়তো এবার আর ব্যর্থ হব না। ইতিমধ্যেই এই দীর্ঘ তিরিশ বছরে মানুষের শরীরের 'জিন'এর ওপর আমার বিশেষ কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট অনেকটা সফল হয়েছে। একজন মানুষকে এভাবে ছ'মাস পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছি। আমি এবার আশা করি সবটুকুই সফল হব। তাহলে এই পৃথিবীতে তোমরাই হবে জরা, ব্যাধিজয়ী সর্বপ্রথম দীর্ঘজীবী মানুষ। মানুষ থেকে অতিমানুষ সৃষ্টির স্বপ্ন হবে আমার সার্থক।

—কিন্তু অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের ধরে এনে বছরের পর বছর এই অনিশ্চিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালাবার অধিকার কে দিয়েছে আপনাকে? গবেষণার নামে এ নির্মম হত্যাকাণ্ড। মেঘনাদ তীব্র-কণ্ঠে বলে উঠলো।

—হ্যাঁ, আমি নির্মম। রাগে বীভৎস আকার ধারণ করেছে বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর মুখমণ্ডল। চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, তোমাদের সভ্য মানুষের ন্যায় নীতি, মূল্যবোধ নিয়ে আমার আর বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। মানুষের সভ্যতার সত্যিকারের অগ্রগতির পথে রক্ত চাই, আরও রক্ত। এ সম্পর্কে আমার মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। আজ রাতে না

হয় আরও দুটি প্রাণের বলিদান হবে মানুষের আগামী কল্যাণের বেদীমূলে।

প্রচণ্ড ক্রোধ আর উত্তেজনায় নিজের শারীরিক আঘাত আর অবসন্নতার কথা বিস্মৃত হয়ে মেঘনাদ ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল ডঃ অরবিন্দ রায়চৌধুরীর ওপর।

কিন্তু তার আগেই গুলির আওয়াজ। পর পর একসঙ্গে অনেকগুলো। না, গুহার মধ্যে নয়—আওয়াজ আসছে দূর থেকে।

প্রায় ঝড়ের মতো বেগে যে রমণীটি গুহা ল্যাবরেটারিতে এসে ঢুকলো তাকে আমরা চিনি—সে শিনকি উপত্যকার পাহাড়ী আদিবাসী গ্রামের দেবিরানী।

—জ্যাঠামনি, সর্বনাশ হয়েছে। আমাদের গুহা আক্রান্ত

তেইশ

[ডাইনোসরের গর্জন]

অকস্মাৎ বজ্রপাতের পর হঠাৎ যেন এক নৈঃশব্দ নেমে এল। কয়েকটি শ্বাসরুদ্ধকর মুহূর্ত। তারপরই বিজ্ঞানী অরবিন্দ রায়চৌধুরী চিৎকার করে উঠলেন—কে আক্রমণকারী? কার এতদূর স্পর্ধা?

—ক্যাপ্টেন সিং তার লোকজন নিয়ে এসে গুহা ঘিরে ফেলে আক্রমণ শুরু করেছে। দেবীরানী ওরফে মঙ্গলা দেবী জানালো।

—ক্যাপটেন সিং! মানে সেনাবাহিনীর সেই ছুঁচোটা? নিজের সমস্ত কাজ ছেড়ে গত কয়েক মাস যাবৎ এই শিনদি উপত্যকায় আমাদের প্রাণ খুঁজে বেড়াচ্ছিল? ডঃ রায়চৌধুরী অস্থির ক্রোধে সারা ল্যাবরেটারি গুহাটার মধ্যে দাপিয়ে বেড়াতে লাগলেন।

বাইরে গুলির আওয়াজ ঘন ঘন শোনা যাচ্ছে। ডঃ রায়চৌধুরী আবার আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ক্রোধ আর ঘৃণায় মুখটা ওঁর বিকৃত দেখাচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন—বিশ্বাসঘাতক তোমাদের আমি রেহাই দেব না। এখন বুঝতে পারছি এ সবই তোমাদের পূর্বপরিকল্পিত ছিল। এতদূরে পালিয়ে এসেও তোমাদের হাত থেকে রেহাই পাইনি।

একটা ছোট্ট শিশি থেকেই ইনজেকসানের সিরিঞ্জে কি এক তরল ভরে নিলেন তারপর মুখে ভয়াল হিংসা ফুটিয়ে বললেন, এক্ষুণি এই সিরিঞ্জের তরল তোমাদের শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেব আমি। মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে তোমাদের সমস্ত শরীর পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যাবে। ভবিষ্যতে আর কোনদিন কারুর সঙ্গে বেইমানি করতে পারবে না।

ইনজেকসানের সিরিঞ্জটা নিয়ে এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছেন উন্মাদ বিজ্ঞানী।

আতঙ্কে সারা শরীরটা আমার পাথরের মতো জমে গেছে। কণ্ঠ থেকে এক টুকরো শব্দ পর্যন্ত বেরুচ্ছে না।

মনে মনে ভগবানকে ডাকতে চাইলাম, কিন্তু দুঃসহ ভয়ে কোন ভগবানের নাম মনে পড়লো না।

আর বাঁচার কোন পথ নেই। মাথার মধ্যে লক্ষ ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। ডঃ রায়চৌধুরী আমার বাঁ হাতটা চেপে ধরে সিরিঞ্জ তুলে ধরছেন···আমি চোখ বন্ধ করলাম···

সেই মুহূর্তে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বাইরে থেকে এক বিকট গর্জন শোনা গেল। এ গর্জন আমার চেনা! সেই বিশাল ডাইনো-সরটার ডাক। ডাকটা যেন এখন আরও ভয়ঙ্কর আরও হিংস্র।

ঝড়ের বেগে কে যেন ঘরে প্রবেশ করলো। কিছুটা সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখি ল্যাবরেটারি গুহার একজন প্রহরী। শরীর দিয়ে তার রক্ত ঝরছে।

উত্তেজিত দুর্বোদ্ধ কণ্ঠে কি যেন সে বলে চললো। শুনতে শুনতে আর্তনাদ করে উঠলো দেবী রানী, তারপর প্রহরীর পিছু ছিটকে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বুঝলাম আরও একটা কিছু সাংঘাতিক বিপর্যয় ঘটেছে। তাকিয়ে দেখি বিজ্ঞানী রায়চৌধুরী পাষাণের মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ওর চোখের পাতা পর্যন্ত পড়ছে না।

'মেঘনাদ ইঙ্গিত করলো—অর্নব এই সুযোগ।

আমরা দৌড়ে বেরিয়ে এলাম গুহাঘর থেকে।

সামনে টানা গুহাপথ। ফাঁকা কেউ এল না আমাদের বাধা দিতে। আমরা এগিয়ে চললাম। বাইরে থেকে গুলির আওয়াজ সেই সঙ্গে ডাইনোসরের গর্জনটা আরও ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে।

আমরা গুহা পথের মুখে এসে দাঁড়ালাম।

চব্বিশ

[অমানুষিক যুদ্ধের পরিণাম]

এই পাহাড়ের অংশটির ঠিক নীচে এক অভূতপূব দৃশ্য।

সেখানে এক লড়াই চলেছে। কিন্তু এ ধরনের লড়াই আজ পর্যন্ত কোন মানুষ কোনদিন দেখে নি। আশ্চর্য, অমানুষিক যুদ্ধ।

ক্যাপ্টেন সিং তাঁর সশস্ত্র লোকজন সঙ্গে নিয়ে ঘিরে ফেলেছেন গুহার সামনেটা। বিজ্ঞানী রায়চৌধুরীর প্রহরীর দল গুহার এদিকে পাহাড়ের আড়াল থেকে তাদের সঙ্গে গুলি বিনিময় করছে। কিন্তু সংখ্যায় তারা মাত্র কয়েকজন।

কিন্তু এই সঙ্গে তেড়ে গেছে সেই বিশাল আকৃতির ডাইনোসরটা।

মাটির ওপর ল্যাজ আছড়ানোর প্রচণ্ড শব্দ সেই সঙ্গে বিকট গর্জনে প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসরটা যেন প্রতি মুহূর্তে ভূমিকম্প ও বজ্রপাত ঘটিয়ে চলেছে।

প্রবল বিক্রমে সে একাই বাধা দিয়ে চলেছে ক্যাপটেন সিং-এর দলবলকে। ক্যাপটেন সিং-এর গুহা প্রবেশের ইচ্ছাকে সে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করে চলেছে।

কিন্তু সে জানোয়ার! হোক না বিশাল অসুর শক্তির অধিকারী —তবু মানুষ তার চেয়ে অনেক কৌশলী, হিংস্র।

প্রতি মুহূর্তে সে আরও বেশি আহত হয়ে চলেছে। ক্যাপটেন সিং-এর দল বন্দুকের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে তার পর্বতপ্রমাণ শরীরটা।

তার গর্জন এখন ক্রমেই আর্তনাদের রূপ নিচ্ছে কিন্তু তবু সে পিছু

হটতে রাজী নয়।

অনেকক্ষণ ধরে চললো এই আশ্চর্য লড়াই। দশ কোটি বছর আগের এক প্রাগৈতিহাসিক জীব তার জীবনদাতার জীবনের রক্ষাকবচ হয়ে তার অন্নের ঋণ শোধ করে চলেছে। যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ একজন আক্রমনকারিকে ও ল্যাবরেটারি গুহার মধ্যে প্রবেশ করতে দেবে না।

হু হু করে রক্ত ঝরছে ডাইনোসরের শরীর দিয়ে। দুর্বলতায় টলে টলে পড়ছে।

তবু পালাতে সে জানে না। দশ কোটি বছর আগের পৃথিবীতে এই কি ছিল লড়াই-এর রীতি? আমৃত্যু সংগ্রাম।

ক্যাপটেন সিং-এর দলের একজন বোধ হয় একটু বেশি সাহসী হয়ে দল ছেড়ে কিছুটা এগিয়ে এসেছিল। ডাইনোসরটা মুহূর্তে তাকে মুখে তুলে নিল। তারপর তার প্রাণহীন ছিবড়ানো দেহটা আছড়ে পড়লো পাহাড়ের গায়ে।

ড্রাগন পাহাড়ের ড্রাগন দেবতার বাহন এবার প্রচণ্ড ক্ষেপে গেছে। ক্ষণে ক্ষণে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে ক্যাপটেন সিং-এর দলকে। দেখতে দেখতে আরও একটা দেহ মুখে করে তুলে নিয়ে চিবিয়ে ছিবড়ে করে ফেলে দিল পাহাড়ের গায়ে।

হঠাৎ এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। তারপর বিকট গর্জনে মুখ থুবড়ে পড়লো পাহাড়ী ড্রাগন—ডঃ রায়চৌধুরীর পোষা ডাইনোসর।

আর উপায় না দেখে ক্যাপটেন সিং হ্যাণ্ড গ্রেনেড ছুঁড়েছেন। ডাইনোসরটার প্রায় শরীরের ওপর এসে ফেটেছে সেই মারাত্মক বিস্ফোরক, প্রকাণ্ড শরীরটা আছড়ে পড়েছে পাথুরে জমিতে।

—ডায়না! ডায়না!

বিদ্যুৎ বেগে গুহার আড়াল থেকে ছুটে এল এক রমণী। পরনে পাহাড়ী আদিবাসীদের মত জংলী পোশাক, হাতে রাইফেল। এতক্ষণ সে গুহার আড়াল থেকে ক্যাপটেন সিং-এর দলের সঙ্গে গুলি বিনিময়

করছিল। সে দেবীরানী—ডঃ অরবিন্দ রায়চৌধুরীর পালিতা কন্যা মিতালী।

দেবীরানী ছুটে গেল ডাইনোসরটার কাছে। ওই বিশাল প্রাগৈতিহাসিক দেহটা একটা পাহাড়ের মত পড়ে আছে ল্যাবরেটারি গুহার সামনের পাথুরে প্রান্তরটায়।

ওর শরীরের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লো দেবীরানী।

ওর লম্বাটে মাথার দিকটা নিজের কোলের ওপর তুলে নিয়ে অশ্রু-সিক্ত কণ্ঠে দেবীরানী বললো—ডায়না, ডায়না, দেখ আমি এসেছি। ওরা কাপুরুষের মত রাইফেল আর গ্রেনেড দিয়ে তোকে হত্যা করলো। ওরা বর্বর, ওরা খুনী। ডায়না, ডায়না, আমার দিকে তাকা—জীবনে তো তুই কখনও আমাকে অমান্য করিস নি—তবে কেন চোখ খুলছিস না···?

মানুষের ভাষা দশ কোটি বছর আগের ওই জানোয়ার বুঝলো কিনা জানি না—কিন্তু দেবীরানীর কান্নায় মুমূর্ষু ডাইনোসরটা অতি কষ্টে একবার চোখ খুলে তাকালো, কিছুক্ষণ তাকিয়েই রইলো দেবী-রানীর দিকে, তারপর শেষবারের মত একবার ডেকে উঠলো—কিন্তু এ তো গর্জন নয় যেন বুক ভাঙা কান্নার সুর, একান্ত প্রিয়জনকে ছেড়ে চলে যাবার হাহাকার···এরপরই ওর মাথাটা ঢলে পড়লো দেবীরানীর কোলের ওপর।

দেবীরানী শিশুর মত কেঁদে উঠলো ওই প্রাগৈতিহাসিক ডাইনো-সরের মাথা কোলে নিয়ে।

ততক্ষণে ক্যাপটেন সিং দেবীরানীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। হাতে তাঁর উদ্যত নিষ্ঠুর রিভলবার।

—ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট।

পঁচিশ

[সদলবলে]

ক্যাপটেন সিং সদলবলে ল্যাবরেটারি গুহার মধ্যে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে আমি আর মেঘনাদ।

ওপক্ষের লোকজন যে কজন ছিল একটু আগে লড়াই এ তারা প্রায় সকলেই অল্প বিস্তর আহত—তাই ধরা পড়তে দেরি হল না।

ল্যাবরেটারি গুহার একেবারে প্রান্তে গুহাটা যেখানে ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হয়ে শেষ হয়ে এসেছে সেখানে লোহার গরাদ দেওয়া বন্দীশালা। তার মধ্যে কয়েকজন স্থানীয় পাহাড়ী আদিবাসী কেউ অর্ধমৃত, কেউ বা মৃতপ্রায়। বিজ্ঞানী রায়চৌধুরীর বিজ্ঞান গবেষণার মানুষ-গিনিপিগ এরা।

তাদেরও গুহার বাইরে নিয়ে আসা হল।

কিন্তু সকল রহস্যের যে মূল নায়ক—সেই বিজ্ঞানী ডঃ অরবিন্দ রায়চৌধুরী কোথায়?

সমস্ত ল্যাবরেটারি গুহা এবং আশপাশের অঞ্চলটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাঁকে পাওয়া গেল না।

সকলের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি অন্তর্ধান করেছেন।

ছাব্বিশ

[অভিযানের শেষ]

জীপ ছুটে চলেছিল কার্টার রোডের পথ ধরে। শিমকি গিরি উপত্যকা এখন অনেক পেছনে।

জীপের মধ্যে আমরা তিনটি প্রাণী।

স্টিয়ারিং হুইল ক্যাপটেন সিং-এর হাতে।

ক্যাপটেন সিং গল গল করে অনেক কথা বলে যাচ্ছিলেন। আজ তাঁর প্রাণে আনন্দের তুফান উঠেছে। শিনকি উপত্যকার বিভীষিকার অবসান ঘটাতে পেরেছেন তিনি। মেঘনাদ কিংবা আমাকে ঠিক সময়ে ডেকে এনে কাজে লাগাতে পারার কৃতিত্ব তাঁর কম নয় সুতরাং একটা ভালরকম সরকারী পুরস্কারের ভাগ্য থেকে কেউই তাঁকে বঞ্চিত করতে পারবে না।

—তবু একটা বিরাট দুঃখ থেকে গেল মেঘনাদ ভাইয়া,—ক্যাপটেন সিং বললেন, দশ কোটি বছর আগের পৃথিবীর অতিকায় ডাইনোসরটা যদি জ্যান্ত ধরতে পারতাম, আজকের পৃথিবীতে এক জীবন্ত বিস্ময় হয়ে থেকে যেতে পারতো। কি রকম হৈ চৈটা হত ভেবে দেখুন।

ডাইনোসরটার কথা তখন আমিও ভাবছিলাম। ভাবছিলাম তার মৃত্যু দৃশ্যটার কথা। বিশেষত দেবীরানীর কোলে মাথা রেখে তার ওই অন্তিম চাউনি—তা যেন কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না আমি। সে দৃষ্টির মধ্যে আমি খুঁজে পেয়েছি প্রিয়জনের কাছ থেকে শেষ বিদায় নেবার বেদনা। কিন্তু এ-ও কি সম্ভব? দশ কোটি বছর পূর্বের জানোয়ার—তারাও কি ভালবাসা, স্নেহ, প্রীতির কথা জানতো। তবে

কি জীবের হৃদয়বৃত্তির জন্ম প্রাণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ? একসঙ্গে অনেক কথা ভিড করছে আমার মনে।

ডাইনোসরটার মৃতদেহ পাঠানো হবে নৃতত্ত্বের গবেষণাগারে। কেটে, ছিঁড়ে দেখা হবে ওর শরীর রহস্য। প্রাচীন জুরাসিক যুগের আরও অনেক অনুদ্‌ঘাটিত রহস্যই হয়তো জানা যাবে দেবীরানীর প্রিয় 'ডায়না'র অস্থি মজ্জা বিশ্লেষণ করে।

—সমস্ত ব্যাপারটাই পাগলামীর চূড়ান্ত। ক্যাপটেন সিং নিজের মনেই হা হা করে হেসে উঠলেন। তারপর হাসি থামিয়ে আবার বললেন ঃ বিশেষত আদি আদিবাসীদের মধ্যে ওঝা সেজে থাকা ওই রমণী 'দেবীরানী' না কি নাম যেন ওর কথাটাই ভাবুন। কথাবার্তা শুনে তো পেটে বেশ বিদ্যে আছে বলেই মনে হল। অথচ জীবনের সব-কিছু ছেড়ে এই দুর্গম জংলী উপত্যকায় খামাখা যত ভূতুড়ে কাণ্ড কার-খানা ফেঁদে বসেছিল—একেই বলে মশাই সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।

—আপনি ভুল করছেন ক্যাপ্টেন সিং—

মেঘনাদ এতক্ষণ বাদে মুখ খুললো,—আপনাকে তো সব ব্যাপারটা আগেই বলেছি তবু বুঝছেন না কেন 'দেবীরানী' যার আসল নাম মিতালী দত্ত, এ জীবনটাই ছিল তার একটা 'মিশন'—সমস্ত জীবনটা সে স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করেছিল তার পিতৃতুল্য বৃদ্ধ বিজ্ঞানী অরবিন্দ রায়-চৌধুরীর গবেষণাকে সফল করার সাধনায়।

—স্ট্রেঞ্জ ! ক্যাপটেন সিং প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। ডঃ অরবিন্দ রায়চৌধুরীর গবেষণার নামে এই সব অসামাজিক দানবীয় কাণ্ডকারখানা আপনি সমর্থন করেন মেঘনাদ ভাইয়া ?

—কে জানে আপনার এ কথার সঠিক উত্তর আমি হয়তো এক্ষুনি দিতে পারবো না ক্যাপটেন সিং, তবে এটুকু আমি বিশ্বাস করি ডঃ রায়চৌধুরীর সাধনা যদি সত্যিই সফল হত মনুষ্য জাতির ইতিহাস যেত বদলে এবং এর পুরো কৃতিত্বটুকু বহন করেই তিনি আগামী কালের মানুষের কাছে হয়ে উঠতেন দেবতা—তাঁর সমস্ত অতীত অসামাজিক

দানবীয় কাণ্ডকারখানা এ গবেষণার মূলে থাকা সত্ত্বেও। এটাই ইতিহাসের সত্য।

—কি বলছেন আপনি মেঘনাদ ভাইয়া! মেঘনাদের দিকে কয়েক সেকেণ্ড ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে ক্যাপটেন সিং কোনক্রমে কথাগুলো উচ্চারণ করলেন।

—এ আমার উপলব্ধি ক্যাপটেন। আপনি যথাসময়ে এসে আমাদের উদ্ধার না করলে বৃদ্ধ উন্মাদ বিজ্ঞানী হয়তো আমাদের তাঁর গবেষণার গিনিপিগ বানিয়ে হত্যা করতেন কিন্তু তবু যা উপলব্ধ সত্য তা অস্বীকার করি কি করে?

অবাক হয়ে শুনছিলাম মেঘনাদের কথাগুলো। মন নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে।

ল্যাবরেটারি গুহার আশপাশে অনেক খুঁজেও ডঃ রায়চৌধুরীর কোন সন্ধান পাইনি। মানুষটা যেন হাওয়ায় মিশে গেছে।

আমার মন বলছিল বিজ্ঞানী ডঃ অরবিন্দ রায়চৌধুরী একদিন আবার ফিরে আসবেন কিংবা অন্য কোথাও শুরু করবেন তাঁর অসম্পূর্ণ গবেষণা—এবার হয়তো এক সুস্থ কল্যাণময় পথে।

আমাদের কারুর মুখে কোন কথা নেই।

ক্যাপটেন সিংএর দৃষ্টি সামনের পাহাড়ে ভাঙা চড়াই উৎরাই রাস্তায়। আমি আর মেঘনাদ তাকিয়েছিলাম দূরে—পাইন, আখরোট জঙ্গলে ঘেরা সেই শিনকি উপত্যকার দুর্গম পথে, যার একটু দূরেই শুরু হয়েছে ড্রাগন পাহাড়। কিন্তু আর কোনো বৈশাখী পূর্ণিমা রাতে সেখান থেকে নেমে আসবে না ড্রাগন দেবতার বাহন—আদিবাসীদের কাছ থেকে জীবন্ত মানুষের অর্ঘ্য নিতে।

আদিবাসীদের ওঝা দেবীরানী আজ সভ্য মানুষের কারাগারে।

ড্রাগন পাহাড়ের রহস্য আজ উদঘাটিত।

জীপ ছুটে চলেছে তীব্র গতিতে।

সিমলা আসতে আর দেরি নেই।

॥ শেষ ॥